প্রেম ও প্রয়োজন

মাঝখানে দালাল দাঁড়াইয়াছিল মহাজন কড়ি গাঙ্গুলী। সেই এহেন অঘটন ঘটাইল, তাহারই যোগাযোগে রমণদাস বিক্রয় করিল। রমণদাস দাম পাইল মন্দ কি!

কড়ি গাঙ্গুলীর নিকট হইতে পাঁচশো টাকার বন্দকী দলিলখানা ফেরত পাইল, আমডহরার জোলে বিঘা সাতেক জমি, আর হালের জন্য একজোড়া গরু। তবে ভবিষ্যতের আশা বিপুল। রমন সেই আশাতেই ভোর হইয়া কাজটা করিল। কড়ি গাঙ্গুলী বোলেচালে ভবিষ্যৎটিকে রমণের চোখের সম্মুখে সুপ্রত্যক্ষ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে রমণদাসের কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া বেশ মিঠা হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল। লোহা নরম হইয়াছে দেখিয়া কড়িও সঙ্গে সঙ্গে ঘা দিয়া বসিল, কহিল—হবে কি? সেদিন মনে কর তোর হয়েছে। কাল দেখবি যখন জুড়িগাড়ি এসে তোর দোরে দাঁড়াবে।

রমণদাস মুগ্ধ হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি দিয়া বসিল। ঘরে স্ত্রী ক্ষুণ ক্ষুণ করিতেই সে গাঙ্গুলীর কথাগুলিই তাহাকে সাড়ম্বরে বুঝাইয়া দিয়া বলিল—কথাটা একটু তলিয়ে বুঝিস, বুঝলি মাগী—তলিয়ে বুঝিস। নইলে মাটি আর গরুর জন্যে কি রমণদাস মেয়ে বিক্রি করে? রমা যেদিন গয়না পরে গাড়ি চড়ে বাড়ির দোরে এসে নামবে সেই দিনই দেখবি। আর গাঁয়ের লোক যেদিন সুপারিশের জন্য এসে জ্বালাতন করবে সেই দিন বুঝবি। ঐ কড়ি গাঙ্গুলী, ওকেও আসতে হবে, দেখিস তুই—ও-ও এসে বলবে, 'দাস, রমাকে বলে এই কাজটা আমার করিয়ে দিতে হবে। না হয় আমার দুটো কান তোর বঁটি দিয়ে কেটে দিস। কথাগুলো পরে না বোঝে তুই বুঝিস।

পরে পাঁচজনেও নির্বোধ নয়, সে কথাটা তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল। কিন্তু পরের ঈর্ষা করা নাকি মানুষের স্বভাব। তাহারা রমণদাসের নিন্দার আর বাকী রাখিল না। পাড়াগাঁয়ে সংবাদপত্রের অভাব আছে সত্য, কিন্তু সংবাদদাতার অভাব নাই। রমণের বন্ধু হেলু মণ্ডল আসিয়া কহিল—আর দাদা, এরই মধ্যে শালাদের ছটফটানির আর অন্ত নেই।

রমণদাস পুলকিত হইয়া কহিল—কি রকম, কি রকম শুনি!

হেলু কহিল—শালারা রাতারাতি ধম্মের গাছ হয়ে উঠেছে। কেউ ধম্ম দেখাচ্ছে, কেউ বলছে পতিত করব। মাগীগুলোর তো ঘাটে পথে ঐ কথা ছাড়া আর কথাই নেই। গালে হাত দিয়ে সব বলছে—হায় কলিকাল,—বিধবা মেয়ে, অ্যা!

রমণদাস হাসিতে শুরু করিল—কি বলছে, পতিত করবে—না? হি-হি-হি। ধম্ম—না কি ভায়া, অ্যা-হি-হি-হি।

সে হাসি তাহার আর শেষ হয় না। স্তরে স্তরে গমকে গমকে বাহির হইতে শুরু করিল। হেলু উঠিয়া গেল। তখনও সে মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে তাহার স্ত্রীর নিকটে আসিয়া অতি বিস্তারে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল—দেখলি মাগী, বলেছিলাম কি না? দেখলি, এরই মধ্যে শালাদের উঁসখুসুনি!

গোবরে পদ্ম ফোটে না, কিন্তু গরিবের ঘরে নীচ জাতির মধ্যে রূপ দেখা যায়। রমণদাস জাতিতে নিম্নবর্ণ, অবস্থায় দরিদ্র, কিন্তু তাহার কন্যা রমা রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে রূপ অপরূপ না হইলেও সুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। রমাকে কাহারও একবার দেখিয়া আশ মেটে না। বরাবর দেখিতে ইচ্ছা করে।

এই রমাই বিক্রয় হইল। ক্রয় করিলেন এই অঞ্চলের জমিদার মহেন্দ্রবাবু। বিপত্নীক জমিদারের বালক পুত্রকে প্রতিপালন করিতে একটি নারীর প্রয়োজন ছিল।

পত্নীবিয়োগের পর বাবু আর বিবাহ করিলেন না। বিগতা ভাগ্যবতী পত্নীর প্রতি প্রেম তাহার একটা কারণ হয়তো বটে, কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল। মহেন্দ্রবাবু সেটা নিজ-মুখেই বলিয়া থাকেন।

—কি হবে আবার বিয়ে করে? আবার কতকগুলো ছেলেপিলের পাল বাড়ানো তো? সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে কেটে ভাগ হবে। ও আমি পছন্দ করি না। বেশী কতকগুলো ছেলেমেয়ে—ও হচ্ছে লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

চাঁদের কলঙ্করেখার মত ঐশ্বর্যের সঙ্গে সত্যের এ দাম্ভিকতা মানায় ভাল। সুতরাং পুত্রের জন্য এখন একটি নারীর প্রয়োজন হইল।

কড়ি গাঙ্গুলী ওরফে এককড়ি গাঙ্গুলী বাবুর মহালের মধ্যে মহাজনী কারবার করিয়া থাকে। বাবুর অনুগত বুদ্ধিমান লোক সে। বুদ্ধিমান কড়ি চট করিয়া বাবুর এই প্রয়োজনটির গুরুত্ব অনুভব করিল। বিজ্ঞাপন না দিলেও এই নারীটির কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রয়োজন তাহাও সে অনুমান করিয়া লইল।

এদিকে রমণদাসের খতখানা যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার রমাও ভাসিয়া যাইতেছে। সব দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে অনুভব করিল এই সুযোগে রমার একটা গতি করিয়া দিলেই সব সমস্যা অতি সহজে মিটিয়া যায়। কারণ বাবুর মনে মনে ছকা বিজ্ঞাপনের নারীমূর্তিটির সহিত রমা যেন খুব ভাল মিলিয়া যাইতেছে। ভরসা করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া পড়িল।

রমণদাসকে রাজী করিয়া সেদিন সে রমাকে লইয়া বাবুর দরবারে হাজির হইল। অজুহাত একটা নালিশের। বিধবা রমাকে দেবর ভাশুর খাইতে দেয় না, বিষয়সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই। নালিশ তাই লইয়া, খোরপোষ কিংবা বিষয়ের ভাগ রমাকে পাইতে হইবে।

মহেন্দ্রবাবু তখন তাঁহার খাস বৈঠকখানার কামরায় বসিয়া ছিলেন। জনা-দুই কর্মচারী সম্মুখের টিপয়টার উপর কতকগুলি খাতাপত্র ফেলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতেছিল। গাঙ্গুলী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তারপর পিছনের পানে উদ্দেশ করিয়া একটা শোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

আয় আয়,—এগিয়ে আয়। পেন্নাম কর পেন্নাম কর। সিঁড়ির নীচে উঁচু দেওয়ালের আড়ে দাঁড়াইয়া রমা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। গাঙ্গুলীর হাঁকে সে কয় পা অগ্রসর

হইয়া আবার দাঁড়াইয়া গেল। গাঙ্গুলী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় কিসের রে বাপু? কান্নাই বা কিসের? বাবুর পায়ে গড়িয়ে পড, সব উপায় হবে তোর।

রমা কিন্তু আড়ালেই দাঁড়াইয়া রহিল। গাঙ্গুলী বিরক্ত হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল—চল ফিরে তোর বাবার কাছে। বাবা কি বলে দিলে তোর? পায়ে চেপে ধরতে বলে দেয় নি? দয়া কি মানুষের অমনি হয়? বাবা তোর আর ভাত দেবে না তা মনে থাকে যেন।

রমা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—সম্পত্তি তারাই ভোগ করুক কাকা, আমি খেটে খাব। বাবুর সামনে আমি যেতে পারব না।

সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। কড়ি গাঙ্গুলী খাঁটি বাস্তব রাজ্যের লোক, সে রমার এই আকুলতা আমলেই আনিল না। একরকম জোর করিয়াই রমাকে সে মহেন্দ্রবাবুর সম্মুখে আনিয়া কহিল—পেন্নাম কর, পায়ের ধুলো নে।

কড়ি গাঙ্গুলীর হাঁকেডাকে সকলেই একটা কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। কিন্তু এমনটি কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

হরিণীর মত শঙ্কিতা, অতি কোমল ফুলের মত একটি নারী। জটিল বিষয়তত্ত্বটির যেন খেই হারাইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু মেয়েটির মুখ হইতে দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারেন না। কর্মচারী দুইজনও চকিতের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। মহেন্দ্রবাবু অকারণে নড়িয়া-চড়িয়া ভাল হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, কি হয়েছে এর? বস তুমি।

কড়ি এতক্ষণে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কহিল—কাজটা শেষ হোক আপনার।

মহেন্দ্রবাবু কড়ির মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, হুঁ। তারপর আর একবার খাতাপত্রগুলি টানিয়া লইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিন্তু জটিল বিষয়টি আরও যেন জট পাকাইয়া বসিয়া আছে। সহসা হাতের পেন্সিলটি ফেলিয়া দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এর পরে নিয়ে এসো। নিজেরা আগে ভাল করে বুঝে তার পরে বোঝাতে এসো।

কর্মচারী দুটিও বাঁচিল। তাহারা নিঃশব্দে খাতাপত্র গুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ির পথে নামিবার সময় তাহাদের চোখে চোখে কি একটা কথার আদানপ্রদান হইয়া গেল। এ-ও একটু হাসিল, ও-ও একটু হাসিল।

মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে কহিলেন—কি, ব্যাপার কি?

গাঙ্গুলী রমাকে বলিল—বল, বাবুকে সব খুলে বল।

কিন্তু রমা যেন মূক হইয়া গেছে।

গাঙ্গুলী একটা ধমক দিয়া কহিল—বল না রে বাপু।

রমা কিছু কহিল না। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু গাঙ্গুলীকে একটা ধমক দিয়া উঠিলেন—তুমিই

বল না হে বাপু। ছেলেমানুষকে এ রকম ধমক দিচ্ছ কেন?

ধমক খাইয়া গাঙ্গুলীর ছাতিটা দশহাত হইয়া উঠিল। আড়ম্বর করিয়া নালিশের বিবরণ সবিস্তারে গোচর করিয়া কহিল—এখন হয়েছে কি জানেন, হতভাগীর একূল-ওকূল দুকূল যেতে বসেছে। এক কূল খেলে কপাল, অন্য কূলে ভাই-ভাজ দিচ্ছে কাঁটা। বাপ-মা তো আর ফেলতে পারে না। কিন্তু ভাই-ভাজের সে সহ্য হয় না। আর তারা পুষতেই বা পারবে কোথায় বলুন। আমার কাছেই তো পাঁচশো টাকা দেনা। বাড়িঘর পর্যন্ত বন্ধক রয়েছে। এখন আপনার চরণে এনেছি, ভাসিয়ে দিতে হয়, কিনারা করতে হয়—যা করতে হয় আপনি করুন।

মহেন্দ্রবাবু কাঁচা লোক নন। বিষয় জট পাকাইতে তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী লোক এ অঞ্চলে আর নাই। জলের ধারে দাঁড়াইয়া তিনি অথই জলের মাছের সন্ধান করিতে পারেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আবার একবার গাঙ্গুলীর মুখের পানে চাহিলেন। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিলেন, শোন—এদিকে।

অন্তরালে গাঙ্গুলীকে কহিলেন, তোমার কি চাই বল?

ভূমিকা তিনি ভালবাসেন না। পরিষ্কার সোজা কথা তাঁহার। গাঙ্গুলী মাথা চুলকাইয়া একটু আমতা আমতা করিতেই তিনি সোজাসুজি কহিলেন—তোমার চেয়ে ঢের বদমাশ আমি গাঙ্গুলী, তোমার মতলব কি খুলে বল দেখি।

গাঙ্গুলী প্রথমেই ধমক খাইয়া একটু ঘাবড়াইয়া গেল। সে কতকগুলা অসংলগ্ন কথা জড়াইয়া একটা অর্থহীন উত্তর দিয়া বসিল—আজ্ঞে তা ওর বাপ-মা—

মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—ওর বাপ-মায়ের দোহাই ছাড়ো। সে থাকলে তো ওর বাপকেই তুমি এখানে আনতে পারতে। ওকে নিয়ে এলে কেন?

—আজ্ঞে ওর নালিশ, ও বাদী—

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—বাদী বিবাদী সাক্ষী সমন উকীল আদালত ওসব ছাড়ো। তোমার নিজের কথা বল। কি চাই তোমার? সেই টাকাটা উদ্ধার তো?

গাঙ্গুলী হাত জোড় করিয়া কহিল—আজ্ঞে এর বাপও পাঁচশো টাকা ধারে।

বাবু ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—অর্ধেক পাবে, আড়াই শো টাকা। খত ওর বাপকে দিতে হবে। আর যা দিতে হয় সে দেব আমি। ও থাক আমার বাড়িতে, ছেলেটাকে মানুষ করবে।

গাঙ্গুলী বাকীটা আর বাবুকে কহিতে দিল না; কৃতজ্ঞতার কলরব তুলিয়া বাবুকে নির্বাক করিয়া দিয়া কহিল—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, সে তো ওর ভাগ্যি, মহাভাগ্যি। নে নে রমা, পেন্নাম কর, পেন্নাম কর। হতভাগা মেয়ে ইদিকে আয়। সে হিড়হিড় করিয়া রমাকে ওপাশ হইতে টানিয়া আনিয়া বাবুর সামনে আবার দাঁড় করাইয়া দিল। প্রণাম করিবার হেতু বুঝিবার কোন প্রয়োজন রমার ছিল না। দুনিয়াতে সে পায়ের তলাতেই তো পড়িয়া আছে। আজ্ঞামাত্র প্রণামও সে করিল। কিন্তু ভাগ্য যে তাহার সহসা কেমন করিয়া

সৌভাগ্য হইয়া উঠিল তাহা সে বুঝিল না। সে তো জানে ভাগ্য তাহার দগ্ধ হইয়া গেছে। পোড়াকপালী যে তাহার ডাকনাম! একান্ত সরল বিস্ময়ে রমা তাহার ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বামুনকাকার পানে চাহিল। বামুনকাকা গদগদ হইয়া কহিল—রাজার মা, তুই রাজার মা হলি রমা। খোকাবাবুকে মানুষ করবি, এখানেই থাকবি। না বিইয়ে গোপালের মা হয়েছিল এক যশোদা আর সেই-ভাগ্যি হল তোর।

এ সংবাদে রমার বঞ্চিত চিত্তে একটা উল্লাস জাগিয়া উঠিল। সে উল্লাসের একটি তরঙ্গ তাহার অধরের তটরেখায় মৃদু উচ্ছ্বাসে দেখা দিল। মহেন্দ্রবাবু রূপের এই নব বিকাশে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী বাবুকে প্রণাম করিয়া কহিল—তা হলে আজ আসি হুজুর।

একাগ্রতা ভঙ্গে বাবু একটু চকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন—মেয়েটি তাহলে বাড়ির ভেতরে যাক।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—ওর বাড়িতে একবার বলা দরকার তো। তা কাল-পরশু যেদিন হোক আমি নিজে এসে—

বাধা দিয়া মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—পরশু নয় কাল। কালই ওকে তুমি নিয়ে আসবে। আর শোন, এদিকে এসো।

আবার অন্তরালে গাঙ্গুলীকে লইয়া গিয়া কহিলেন—বেশী চাল চালতে যেও না, গাঙ্গুলী। তাহলে হবে সবই, মধ্যে থেকে মরবে তুমি। বুঝলে?

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—সর্বনাশ, সর্বনাশ! দেখুন দেখি, আমার ঘাড়ে কি দশটা মাথা গজিয়েছে নাকি? কালই আমি ওকে নিজে সঙ্গে করে এনে রেখে যাব।

বাবু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—আচ্ছা।

—আর নেহাৎ যদি কাল না হয় তবে পরশু।

বাবু কহিলেন—হুঁ যাও।

গাঙ্গুলী কিন্তু গেল না। দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বাবু কহিলেন—হ্যাঁ—তাহলে আজ যাও।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গাঙ্গুলী আবার ফিরিল। এবার যেন মরীয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—আজ্ঞে আমার টাকার ব্যবস্থাটা তা হলে—

মহেন্দ্রবাবু ফিক করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, সে হবে, তোমার দায়ে আমি ইনসলভেন্সি নেব না। ও যদি কাল এখানে আসে তো পরশু তোমার ব্যবস্থা হবে। টাকাটা যে দেব সে আমি ওর সম্পত্তির দাম থেকে দেব। ও এসে ওর স্বামীর সম্পত্তি আমাদের লিখে দেবে। সেই দাম থেকে তুমি টাকাটা পাবে। তারপর ওর দেওর ভাসুরের সঙ্গে আমি বুঝে নেব। নইলে মানুষ কেনা তো আমার ব্যবসা নয়।

গাঙ্গুলী সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর আবার বাবুকে গিয়া কহিল—ও আর বাড়ি গিয়ে কি করবে? আজ থেকেই এখানে থাক। আমি বাড়ি গিয়ে সব বলব'খন।

বাবু কহিলেন—না যাক, একবার ঘুরেই আসুক।

বেশ প্রসন্ন মন লইয়া গাঙ্গুলী ফিরিতে পারিল না। দেনাপাওনার সংসারে সে ধারে কারবার পছন্দ করে না। অন্ততঃ ধারে দেওয়া গাঙ্গুলীর নীতি নয়; দোকানী গুপো দত্তর কথাটা তাহার খুব ভাল লাগে। দোকানে ধার চাহিলে সে বড় বড় গোঁফ জোড়াটা নাড়িতে নাড়িতে সবিনয়ে কহে—বিলাত ফেলতে আমি পারব না বাবা। বিলাত এখান থেকে অনেক দূর। সে যাবার ক্ষমতা আমার নাই।

ধার দেওয়াকে গাঙ্গুলীর দেশে বলে বিলাত ফেলা। গাঙ্গুলীও মনে মনে তাহার এই বিলাতের কথা ভাবিতেছিল। তাহার বিলাত যাইতে তো লাগিবার কথা একদিন। কিন্তু মধ্যের ব্যবধানে সমুদ্র যদি অকস্মাৎ পরিধিতে বাড়িয়া যায়! কিংবা কাঁপিতে থাকে! তবে? লাল কাঁকর বিছানো সরকারী পাকা রাস্তা বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া বিসর্পিল গতিতে চলিয়া গিয়াছে। দুপাশে শ্যাম-শোভাময় অবারিত মাঠ। উপরে আকাশ প্রসন্ননীল। আশ্বিনের প্রথমেই আউশ ধানের সদ্যোদ্গত মঞ্জরীগুলি হইতে একটি হৃদ্য মৃদু গন্ধ উঠিতেছে। শরতের রৌদ্রের একটি সুপ্রসন্ন শুভ্রতা মানুষের চিত্তে অকারণে উল্লাস জাগাইয়া তোলে। রমার চিত্তেও ঠিক এমনি একটি মৃদু উল্লাস জাগিয়াছিল। রাস্তায় ঠিকাদারের লোক রাস্তা মেরামত করিতে লাগিয়াছে। সাঁওতাল পুরুষ-নারী সব, সকলের সবল কালো দেহে সুস্থতার একটি স্নিগ্ধ আনন্দ।

রুক্ষ চুলে জবাফুল গোঁজা, দৃঢ় দেহের সবল লীলায়িত গতির সঙ্গে সঙ্গে জবার শীষগুলি তালে তালে নাচিতেছে।

রমার বেশ ভাল লাগিল এদের। একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ার তলায় একটি নধরকান্তি শিশু একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের উপর শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতেছিল। তাহার মা আসিয়া কৃত্রিম কোপে আপন ভাষায় তিরস্কারের মধ্য দিয়া তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল। শিশুটি পরমানন্দে জননীর বুকভরা স্নেহধারা পান করিতে আরম্ভ করিল। মায়ের বুকের খাটো কাপড়খানি অবোধ শিশুর হাতের টানে খসিয়া গেছে। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, কোন সংকোচ নাই মায়ের। লজ্জা যেদিক দিয়া মানুষের মনে আসে জননীটি বোধ করি সেদিকের পানে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল।

রমা বার বার মুখ ফিরাইয়া ওই মা ও শিশুটিকে দেখিতেছিল। গাঙ্গুলীকাকা বড় খর-গতিতে চলিয়াছে, নতুবা একটু দাঁড়াইত সে ঐ গাছতলাটিতে। চলিতে চলিতে রমা সহসা প্রশ্ন করিল—বাবুর ছেলেকে দেখেছ তুমি কাকাঠাকুর? কাকাঠাকুর তখনও মনে মনে বিলাতের দূরত্ব-সীমা জরীপ করিতেছিল। তবু সে অন্যমনস্ক ভাবেই কহিল—হুঁ!

—খুব সুন্দর, না?

—হুঁ।

—কত বড় বটে?

কাকাঠাকুর আর কথা কহিলেন না।

রমা আবার প্রশ্ন করিল—আমাদের ঘেটুর মত?

গাঙ্গুলী সহসা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—বকবক করে বকিস নে বাপু। এত

* * *

বেহায়া তুই তা আমি জানতাম না। গলায় দড়ি দিস একগাছ।

এ তিরস্কারে মেয়েটির মৃদু আনন্দটুকু নির্বাপিত সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোর মত মিলাইয়া গেল। বড় বড় চোখ দুটির বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া রমা এককড়ির পানে চাহিল। বিস্মিত বিষণ্ণ সে দৃষ্টি। বাক্যের রূঢ়তায় সে আঘাত পাইয়াছিল। আর সবিস্ময়ে সে ভাবিতেছিল গলায় দড়ি দিবার মত বেহায়াপনা সে কি করিল।

মাথা অবনত করিয়া সে গাঙ্গুলীর পিছনে পিছনে চলিয়াছিল। চোখের জল যদি পড়ে তবে মা ধরণী সে অপরাধ তাঁহার আপন বুকে লুকাইবেন।

এ শিক্ষাটুকু রমা নিজে অর্জন করিয়াছে, কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় নাই।

বাবুর বাড়িতে ঢুকিয়া রমা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঐশ্বর্যের এমন প্রদীপ্ত আত্মপ্রকাশ সে আর কখনও দেখে নাই। তাহাদের গ্রামের চাটুজ্যেদের ছোট ছেলে কলিকাতায় কাজ করে। তাহার ঘর দেখিয়া তাহার কত আনন্দ হইত। ঘরটিতে একখানি তক্তপোষ, দেওয়ালে ছোট বড় কতগুলি ছবি টাঙানো। বাক্সগুলি বৃন্দাবনী ছিটের ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা থাকে। ছোট একটি টুলের উপর একটি কলের গান।

আর এখানকার প্রতিটি জিনিস এত উজ্জ্বল যে স্পর্শ করিয়া দেখিতে রমার ভয় হইল। সাপের জিভের মত একটি সূক্ষ্ম দীপ্ত রশ্মি যেন বিকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ঘরের মেঝেগুলো এত পিছল আর শীতল যে রমা চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই। সে তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মেঝেটায় হাত বুলাইয়া দেখিল। কই, জল তো হাতে লাগে নাই! সে সবিস্ময়ে মেঝের উপর আবার হাত রাখিয়া মর্মরের শীতলতা অনুভব করিল।

কে পিছন হইতে কহিল—কি করছ?

পিছন ফিরিয়া রমা দেখিল ও-বাড়ির নলিনী দিদিমণি।

এই নলিনী দিদিমণিই খোকাবাবুকে এতদিন মানুষ করিতেছিল। নলিনী দিদিমণি নাকি ডাক্তারি পাস করা মেয়ে। গিন্নীমায়ের অসুখের সময় সে এখানে আসিয়াছিল। তাঁর মৃত্যুর পর খোকাবাবুকে মানুষ করিবার জন্য তাহাকে রাখা হইয়াছিল। এখন আবার তাহাকে বাবুর ডাক্তারখানায় কাজ করিতে হইবে।

সলজ্জ বিস্ময়ে সে মৃদুস্বরে কহিল—এত ঠাণ্ডা!

—মার্বেল পাথর কিনা। মার্বেল পাথর ভারী ঠাণ্ডা হয়। এখানে সব ঘরেই মার্বেল দেওয়া আছে। ঘরে চলো না, দেখবে এখন মার্বেলের বেদী। গরমের সময় শোবে দেখবে কত আরাম।

নলিনী হাসিল।

রমা সবিস্ময়ে নলিনীর পানে চাহিল। সে মার্বেল পাথর কি তাহা তো জানে না। কিন্তু সে প্রশ্ন করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল।

নলিনী কহিল—এস, তোমায় সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিই। আমার ওপর আবার ভার পড়েছে।

চলিতে চলিতে নলিনী আবার কহিল—জান তো একজনের জবাব হলে তাকে কাজের ভার নতুন লোককে বুঝিয়ে দিতে হয়!

রমা জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। রমাকে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কসাইয়ের কাছে জানোয়ার-বাচ্চা সুন্দর হলে কি আসে যায়?

কাহাকে কি উদ্দেশে কথাটা নলিনী বলিল রমা বুঝিতে পারিল না।

সে কহিল—কি বলছ দিদিমণি?

—বলছি ভগবানের বিচারের কথা। কসাইয়ের সঙ্গে ভগবানের কোন তফাত নাই।

রমা কহিল—ছি, ঠাকুর-দেবতাকে অমন কথা বলতে নাই।

নলিনী হাসিয়া কহিল—আর বলব না। এস এখন, যা করতে চলেছি তাই করি।

সমুখের ঘরখানায় ঢুকিয়া রমা অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। দেওয়ালের এমন সুন্দর রঙ! আকাশের রঙের সঙ্গে কোন তফাৎ নাই। তাহার মধ্যে আবার এমন সুন্দর লতা পাতা ফুলের সারি! নলিনীর অলক্ষ্যে সে চট করিয়া একবার দেওয়ালে হাত বুলাইয়া দেখিল। নলিনী তখন কলের পাখা দেখাইতেছিল। কেরোসিন তেলের জোরে নাকি পাখাটা আপনি ঘোরে।

দেওয়ালের গায়ে এত বড় বড় ছবি রমা আর কোথাও দেখে নাই। একটায় যেন ঠিক সূর্য উঠিতেছে। আবার একটায় আকাশের গায়ে ঘন মেঘ জমিয়াছে, মেঘের প্রতিটি স্তর দেখা যাইতেছে। আর একদিকে চাহিয়া রমা লজ্জায় মরিয়া গেল। উলঙ্গ একটি মেয়ের ছবি রহিয়াছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ঠিক তাহারই পাশে আরও একটা। কিন্তু মেয়ে দুটি বড় সুন্দর। রমা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কহিল—চল দিদিমণি, ও-ঘরে যাই।

সে ঘরটায় প্রবেশ করিয়া রমা চমকিত হইয়া উঠিল। এ কি! চারিদিকে সে আর নলিনী দিদিমণি!

রমার সুপরিস্ফুট চমক কাহারও চোখ এড়াইবার নয়। নলিনী হাসিয়া কহিল—আয়না-ঘর এটা। এই ঘরে সাজপোশাক করতে হয়। চুল বাঁধতে হয়।

—এত বড় আয়না? মানুষের চেয়েও উঁচু?

একখানি আয়না অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করিয়া দেখিতে দেখিতে সে আবার কহিল—এত আয়না কি জন্যে দিদিমণি?

—আশপাশ পেছন সামনে সব দেখা যায়। দেখবে যখন চুল বাঁধবে এ ঘরে বসে।

নলিনী একটা আশ্চর্য হাসি হাসিল। রমার তাহা ভাল লাগিল না। সে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার পূর্বেই নলিনী ত্রস্তভাবে কহিল—ওমা বাবু যে! এস এস, চলে এস।

নলিনী চকিতের মধ্যে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোটি পুরুষ চারিদিক হইতে রমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। রমাও পলাইতে গেল। কিন্তু মার্বেলের অতি মসৃণতায় পা পিছলাইয়া সে একটি অতি অস্ফুট চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। চারিদিকে দর্পণে ভীতকম্পিতা স্খলিতবাসা তরুণীর অনাবৃত যৌবন তাঁহার বুকের মধ্যে যেন একটা নেশা জাগাইয়া তুলিতেছিল। শুধু নেশা নয়,—একটা অনুকম্পাকোমল মোহও তাহার মধ্যে ছিল। অবলা মেয়েটির এই ভীতিত্রস্ত ভঙ্গী তাঁহার বড় ভাল লাগিল। নতুবা এই পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার বিরক্ত হইবার কথা। অন্য কেহ এমনভাবে পড়িয়া গেলে তাহাকে অকর্মণ্য অপদার্থ বলিয়া ধমক দিতেন,—তাহার জবাব হওয়াও বিশেষ আশ্চর্যের কথা ছিল না। ভ্রূও তাঁহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই কোমল মোহটা তাঁহার সমস্ত মনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সঞ্চারিত হইতেছিল। সেই মোহবশে তিনি নিজেই আসিয়া রমাকে দুটি বাহুতে ধরিয়া তুলিলেন। স্পর্শেরও একটা রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে। প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও ঘুমন্ত মানুষ সাপের শীতল স্পর্শে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, অঙ্গ তাহার জুড়াইয়া যায় না। মহেন্দ্রবাবুর স্পর্শেও এমনি একটি রূপ ছিল, রমা শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তে মুহূর্তে মহেন্দ্রবাবুর মুঠি দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। সবল দৃঢ় পেষণে তাহার বাহু দুইটি যেন ভাঙিয়া যাইতেছিল। রমার যন্ত্রণার অবধি ছিল না। কিন্তু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে তাহার সাহস হইল না। হাজার অবলা হইলেও সে নারী। পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ এবং সে সম্বন্ধের স্বরূপ যে কি, একটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আপনি তাহার জানা হইয়া গেল। ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষুধাবোধের মত এ বোধ নারীর নির্দিষ্ট বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জাগে। মানুষের মধ্যে এ প্রকৃতির জাগরণ।

রমা প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কা করিতেছিল। সমস্ত শরীর তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। বিদ্রোহ করিবার মত শক্তি এ সংসারে সকলের থাকে না, কিন্তু খানিকটা বাধা দিবার উপযুক্ত শক্তি সকলেরই আছে, চিৎকার করিতেও মানুষ পারে। কিন্তু এই জাতীয় মানুষের সে সাহস কখনও থাকে না। রমা ভয়ে চোখ মুদিয়া ফেলিল। তাহার চোখভরা জল চোখের পাতার চাপে গাল বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। মহেন্দ্রবাবুর সুদৃঢ় মুঠি শিথিল হইয়া আসিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহারও মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। অকস্মাৎ দুটি কথা রমার কানে আসিয়া পৌঁছিল—ছেড়ে দিন!

নলিনী দিদিমণির কণ্ঠস্বর।

নলিনীর কণ্ঠস্বরে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ়তা ছিল। যে স্বরে আঘাত বা অমর্যাদা কাহাকেও করে না, কিন্তু দৃঢ়তায় সে অলঙ্ঘনীয়। মহেন্দ্রবাবু নলিনীর সম্ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চমকিয়া

উঠিলেন। মৃদু আকর্ষণে রমার হাতখানি আকর্ষণ করিয়া নলিনী আবার তেমনি ভাবে কহিল—ছেড়ে দিন!

মহেন্দ্রবাবু ছাড়িয়া দিলেন। কম্পিতা রমার হাত ধরিয়া নলিনী ধীরভাবে অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন সহজ মানুষ হইয়া উঠিলেন। চিত্তের অপরাধ-বোধের ক্ষণিক দুর্বলতা তাঁহার ক্রমশঃ কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তিনি ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিলেন। কর্তৃত্বাভিমানী মানুষের মনে যে সুলভ অপমানবোধ থাকে—সেই বোধ বিপুল ক্ষোভে জাগ্রত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড উগ্রতায় তিনি ভীষণ হইয়া উঠিলেন। একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল—নলিনী!

শান্ত, সহজ স্বরে উত্তর আসিল—আসছি আমি।

মেয়েটার স্পর্ধায় মহেন্দ্রবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন সহজভাবে কেহ কখনও তাঁহার ক্রোধকে উপেক্ষা করে নাই। দারুণ ক্রোধে তিনি যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু সে তাঁহার অভ্যাস নয়। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ কখনও তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার ক্রোধ কাজ করে সাপের মত। আলোকে সে বাস করে বিবরে, শত্রুর দুর্দশা-রজনীর অন্ধকারে বিপুল গর্জনে আত্মপ্রকাশ করিয়া আক্রমণ করে।

মহেন্দ্রবাবু আর সে ঘরে দাঁড়াইলেন না। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আপনার বসিবার ঘরে তিনি চলিয়া গেলেন। মুক্ত জানালার পাশে একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। আবার তিনি উঠিলেন। বড় আলমারীটা চাবি-বন্ধ ছিল না, থাকেও না—সেখান হইতে টানিয়া বাহির করিলেন বোতল ও ছোট একটি গ্লাস। মদ তিনি খান, কিন্তু অপরিমিত পানকে তিনি ঘৃণা করেন। ছোট গ্লাসটি তাঁহার পরিমাপের পরিমিত নির্দিষ্ট। গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ঢালিয়া সেটুকু নিঃশেষে পান করিলেন। তাহার পর একটা সিগারেট ধরাইয়া ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। সিগারেটটা টানিতে টানিতে তিনি ভাবিতেছিলেন এটা বোধহয় নলিনীর বিদ্বেষ। তাঁহার অধরে মৃদু একটি হাসি খেলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্বের ক্ষোভ তাঁহার আনন্দে রূপান্তরিত হইতেছিল।

সম্মুখের ভেজানো দরজা খুলিয়া গেল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া চাহিয়া দেখিলেন নলিনী ঘরে প্রবেশ করিতেছে। এটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার ক্রোধের সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া কেহ কখনও দাঁড়ায় নাই। নলিনী কহিল—আমায় ডাকছিলেন আপনি?

মহেন্দ্রবাবু চেয়ারটার উপর খাড়া হইয়া বসিলেন। কথা তিনি মনে মনে খুঁজিতেছিলেন।

নলিনী আবার কহিল—কি বলবেন বলুন? আপনার সঙ্গে এক ঘরে এমন করে বসে থাকাটা লোকের চোখে বড় খারাপ ঠেকবে।

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন—কে তোমায় আসতে বললে? আসার তো কোন

প্রয়োজন ছিল না ?

একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া নলিনী একটু হাসিল। তারপর কহিল—তাহলে বোধ হয় আমারই ভুল হয়ে থাকবে। আমি যেন শুনলাম আপনি আমায় ডাকলেন। যাক্, আমারও একটু দরকার ছিল।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। নলিনী একখানা কাগজ বাহির করিয়া চেয়ারটার হাতলের উপর নামাইয়া দিল। তারপর একটা নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্যই দরজাটা খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পিছন হইতে মহেন্দ্রবাবু ডাকিলেন—শোন।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু কাগজখানা ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন—এর মানে ?

শান্তস্বরে নলিনী উত্তর দিল—ওর মানে তো খুবই সহজ। আমি কাজে জবাব দিচ্ছি। আমি আর এখানে থাকতে চাই না।

—কেন ? মহেন্দ্রবাবুর ললাটে বিরক্তির সারি সারি কুঞ্চিত রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নলিনীর চোখে-মুখেও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল—এর আমি জবাব দিতে চাই না। এ বিষয়ে নিশ্চয় আমার স্বাধীনতা আছে।

মহেন্দ্রবাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিবরের ভুজঙ্গ পরিপূর্ণ আলোকে আত্মপ্রকাশ করিতে চায় না সত্য, কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিলে সে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। বিপুল গর্জনে তখন সে বাহির হইয়া আসে। একটা বেতনভোগিনীর বার বার এরূপ ঔদ্ধত্যে তাঁহার বাহ্যিক ক্রোধহীনতার মুখোশ সহসা যেন খসিয়া গেল। কর্কশ কণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—জান তুমি, এখানে তোমায় খুন করে দিলেও আমার কিছু হয় না। স্ত্রীলোক বলে রেহাই আমার কাছে নাই। সাবধান হয়ে কথা বল তুমি।

অকস্মাৎ এমন উত্তর নলিনী প্রত্যাশা করে নাই। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হইয়া গেল। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে সে কহিল—তা আমি জানি। সে তো আমার না-দেখা নয়। আমি নিজের চোখেই যে তা দেখেছি।

এ কথায় মহেন্দ্রবাবু কেমন যেন হইয়া গেলেন। সর্বনাশী মেয়েটার অভিযোগটা যে ভীষণ। তিনি নলিনীর দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নলিনী বলিয়াই গেল—আপনার স্ত্রীকে যেভাবে আপনি হত্যা করেছেন, স্লো-পয়জেন করা তার চেয়ে ভীষণ কিছু নয়। আইনের চোখে এটা হত্যাপরাধ নয়, কিন্তু একদিন এক জায়গায় এর বিচার হয়ত হবে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি ফুটিল। তিনি কহিলেন—বিচার যদি হয় তবে তোমার নাম সাক্ষীর তালিকায় থাকবে নিশ্চয়। যাক্ এসব মতলব ছাড়। আর একবার যদি এমন কথা তোমার মুখে শুনি—তোমায় সত্যিই আমি খুন করাব।

—তা হয়ত পারেন। কিন্তু সে আপনাদের ওই সরল নিরক্ষর চাষী প্রজাকে। আপনি

তো আমার পরিচয় জানেন। বেশ্যার মেয়ে আমি। আপনাদের এই ধনী জাতদের সর্বনাশ করা আমার না হোক—আমার জাতের পেশা। আমার মা এখনও বেঁচে আছেন। আমাকে খুন করা খুব নিরাপদ হবে না জানবেন। আপনাদের জমিদার জাতটাই এমন আত্মম্ভরী। আপন এলাকার মধ্যে নিজেদের রাজা বলতেও আপনাদের লজ্জায় বাধে না। তাই এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

মহেন্দ্রবাবু এবার চুপ করিয়া গেলেন। শূন্য-গর্ভ বস্তু আঘাতের উত্তরে বিপুল গর্জন করিয়া উঠে, দুনিয়া তাহাকে ভয় করে না। কিন্তু নিরেট লোহার আঘাতে যে শব্দোত্তর আসে তাহা মৃদু তবে দৃঢ়তার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় তাহার মধ্যে থাকে। ওই দৃঢ় মৃদুস্বরের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে। সে উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরং আঘাতকারীর চিন্তার বস্তু।

মহেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ পর কহিলেন—আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

নলিনী ফিরিল। মহেন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন—হ্যাঁ, খোকার গয়নাগুলো আর তোমায় কিছু গয়না দেওয়া হয়েছিল—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—খোকার গয়না আমি খাজাঞ্চীবাবুর জিম্মায় দিয়েছি, কখানা তার গায়ে আছে। তার রসিদ আমি খাজাঞ্চীবাবুর কাছ থেকে নিয়েছি। আর আমার—সেগুলো তো আমারই প্রাপ্য। জীবনের কৃতকর্মের গ্লানিকে আমি ভুল বলে মাথায় করে নিয়ে যেতে চাই না। আমার জন্মগত পেশা বলেই জমা-খরচ করতে চাই। সে আমার কাছে আছে।

এতক্ষণে মহেন্দ্রবাবু যেন কূল পাইলেন। তিনি চেয়ার হইতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন—পুলিসে খবর দেব আমি।

নলিনী এ কথার কোন জবাব দিল না। ধীরভাবে দরজা খুলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া দরজাটায় হাত দিলেন। কিন্তু কি মনে হইল, আর দরজাটা খুলিলেন না। চিন্তান্বিত ভাবে চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার হাঁকিলেন—কানাই!

কানাই বাবুর খাস খানসামা। সে আসিতেই তিনি কহিলেন—মেয়ে ডাক্তারের ফাইল নিয়ে কেরানীবাবুকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আর শোন, আলমারী থেকে বোতলটা—না থাক্, এক গ্লাস ঢেলে দিয়ে যা শুধু।

কানাই চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু আবার একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দরজাটার বাহিরে কে গলা ঝাড়িয়া আপনার আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—এস।

কেরানীবাবু আসিয়া একটা ফাইল চেয়ারের হাতলটার উপর নামাইয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। দেখিয়া

শুনিয়া ফাইলটা বন্ধ করিয়া বলিলেন—ইনি রেজিগনেশন দিচ্ছেন। কিন্তু এগ্রিমেণ্ট রয়েছে দেখছি আরও তিন মাসের। এঁকে একটা নোটিশ দিয়ে দাও যে আমরা তোমার রেজিগনেশন নিতে পারব না। তুমি যদি চলে যাও তবে ক্ষতির দায়ী হতে হবে। আর একজন কাউকে সদরে পাঠিয়ে দাও, সে উকিলদের কাছে জেনে আসুক এর জন্য ফৌজদারী সোপর্দ করা যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত টিকুক চাই না টিকুক প্রথমটায় এমন একটা কিছু করা যায় কিনা।

নীরবে কেরানীবাবু ফাইলখানা তুলিয়া লইলেন। তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—একটি ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। টিউবওয়েল কোম্পানীর লোক নাকি।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—হুঁ। কেরানীবাবুর আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। তিনি দরজার দিকে ফিরিলেন। পিছন হইতে বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তাকে থাকতে বল আজ। কাল তার সঙ্গে কথা কইব। গ্রামের মধ্যে তিনটে টিউবওয়েল করিয়ে দেব ভাবছি। বড় জলের কষ্ট গ্রামের মধ্যে।

কেরানীবাবু এবার দরজায় হাত দিয়েছিলেন। বাবু কহিলেন—আর তোমাদের খালি পালাই-পালাই শব্দ! গভর্নমেণ্ট হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্টে একখানা পত্র লেখ দিকি টিউবওয়েল বসানোর কথা জানিয়ে। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন হয়ে গেল, কেউ যদি কিছু ভাবে!

কেরানীবাবু যাইতে যাইতে কহিলেন—কড়ি গাঙ্গুলী এসে বসে আছে।

অকস্মাৎ খড়ের আগুনের মত মহেন্দ্রবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন—যাও, যাও, যা বললাম তাই কর গিয়ে। ওটাকে দূর করে দিতে বল কাছারী থেকে।

ততক্ষণে কেরানীবাবু নিজের পশ্চাতে দরজাটার আড়াল দিয়া বাঁচিয়াছেন।

মহেন্দ্রবাবু চিন্তা করিতেছিলেন দেশের ম্যালেরিয়ার কথা। এ চিন্তা বড়লোকের শখ কি না কে জানে, কিন্তু তাঁহার এ চিন্তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। জীবনের পাপ, পুণ্য, ন্যায়, অন্যায়, আত্মীয়-সমাজ সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন গতিতে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ এক-একসময়ে এই বিচিত্র মানুষটির মনে এই ধারার চিন্তা জাগিয়া উঠিত। তখন অর্থের প্রতি মমতা তাঁহার থাকিত না, আপন দেহের প্রতি দৃকপাত করিতেন না। অকস্মাৎ ভূমিকম্প-জীর্ণ পাথরের বুক হইতে নির্ঝরিণী উৎসারিত হইত। আবার অকস্মাৎ সে উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইত। সেদিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও তখন তাঁহার থাকিত না। তখন তিনি নিজের মনে মনেই বলিতেন—নির্বোধ—নির্বোধের কাজ হয়েছে এটা! এক-একসময় নির্বোধটা কেমন করে যে প্রবল হয়ে ওঠে!

দরজার বাহিরে আবার কাহার অতি কুণ্ঠিত মৃদু সাড়া পাওয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু ঈষৎ বিরক্তিভরেই কহিলেন—কে?

দরজা অল্প ফাঁক করিয়া কড়ি গাঙ্গুলীর লম্বা মুখখানি উঁকি মারিল।

রুক্ষস্বরে মহেন্দ্রবাবু কহিলেন—কি?

—আজ্ঞে আমার একটু কাজ ছিল।

—পরে এস। আমার শরীরটা ভাল নেই।

দরজাটা বন্ধ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু অল্প একটু হাসিলেন। মানুষের এই ধরনের ভয় দেখিয়া বড় কৌতুক বোধ হয় তাঁহার। কিন্তু কি একটা কথা অকস্মাৎ তাঁহার মনের মধ্যে উদিত হইতেই তিনি উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন। দরজার ধাক্কায় ওপাশে কে একজন মৃদু আর্তনাদ করিয়া উঠিল। বাবু দেখিলেন কড়ি গাঙ্গুলী নাকে হাত বুলাইতেছে। দরজার ধাক্কাটা বেচারার নাকে আঘাত করিয়াছে। আঘাতের উপরেও বেচারা মহেন্দ্রবাবুর সহিত চোখাচোখি হইতেই চমকিয়া চোরের মত ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাকে কঠোর কিছু বলিলেন না।

বরং মৃদুস্বরেই কহিলেন—এই যে তুমি আছ। ভালই হয়েছে, শোন দিকি!

কড়ি চতুর লোক, গরজের দাম সে বোঝে। মুহূর্তে তাহার ভোল পাল্টাইয়া গেল। সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বাবুর অনুসরণ করিয়া ঘরের মধ্যে বিনা আদেশেই একখানা চেয়ার টানিয়া জাঁকিয়া বসিল। এবং সে-ই প্রথম কথা কহিল—আপনার দরজাগুলো ভারী বিশ্রী।

মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন—একটা বাঁদরকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা লাফিয়ে বসল একেবারে চেয়ারটার মাথায়। ফলে চেয়ারটা গেল উল্টে। তখন বাঁদরটাও ঠিক একই কথা বলেছিল, বুঝেছ গাঙ্গুলী!

গাঙ্গুলী হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিল। 'সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' কথাটার দাম গাঙ্গুলীর বেশ জানা আছে, বহু ক্ষেত্রেই বহু ব্যঙ্গই হাসিয়া উড়াইতে হয় তাহাকে।

মহেন্দ্রবাবু তাহার হাসিটা কমাইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন, শোন—আমি তোমার সেই টাকার কথা ভাবছিলাম। এখনও তো মেয়েটির দলিল হয় নি—

গভীর অভিনিবেশের সহিত গাঙ্গুলী শুনিতেছিল, এবং কথার শেষ যে কি হইবে তাহাও সে মধ্যপথে বুঝিয়া লইয়াছিল। সুতরাং সে মধ্যপথেই বলিয়া বসিল—তার আর কি! আজই দলিল হয়ে যাক।

—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম, তুমি এখানে এসেছ, দলিলখানা তুমিই থেকে ওর টিপসই-টই সব করিয়ে দাও না। মেয়েটিও এখানে নতুন, কিছু ভাবতেও তো পারে।

হাসিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আজ্ঞে না, সে ভয় কিছু নাই। জানোয়ারেও মাথা নাড়ে, কিন্তু রমা—

অকস্মাৎ বিরক্ত হইয়া বাবু কহিলেন—এইটেই আমি ঠিক পছন্দ করি না এককড়ি। মানুষের যদি আত্মা বলে বস্তু না থাকে—তবে সে কি মানুষ!

কড়ি এ কথার উত্তর বোধহয় জানিত না, কিংবা সে যাহা জানে তাহা দিতে সাহস করিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার কহিলেন—না, এই মানুষই ভাল এককড়ি। এদের রাগ কখনই হয় না। অন্যায়ে অবিচারে এরা দুঃখ করেই সন্তুষ্ট থাকে। যাক, প্রয়োজনের পক্ষে এরা খুব ভাল। দেখ, এখানে যে মেয়ে-ডাক্তারটি আছে সে বোধহয় মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে ভড়কে দিচ্ছে।

গাঙ্গুলী গরজের কথাটার এতক্ষণে হদিস পাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একখানা কণ্ঠস্বর দশখানা হইয়া উঠিল—দেখুন দিখি, সে হারামজাদীর কি সাধ্যি রমাকে ভাংচি দেয় আমি থাকতে! রাধে! রাধে! রমা সে মেয়েই নয়। বলুন না এখুনি তার চুলের মুঠি ধরে দিই আপনার পায়ের জুতোয় তার পিঠ ভেঙ্গে।

দরজার বাহিরে আবার সাড়া উঠিল।

বাবু কহিলেন—কে?

—আজ্ঞে আমি। এস্টেটের নায়েবের কণ্ঠস্বর।

—এস। জরুরী কাজ আছে কি কিছু?

—কয়েকটা মামলার দিন আছে কাল।

—হ্যাঁ, যাই চল। কড়ি, তা হলে তুমি ওবেলা এস।

কড়ি চুপি চুপি কহিল—একটু বসলে হত না হুজুর? আমি দিতাম আপনার সামনেই রমাকে শাসিয়ে।

বাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—এখন থাক।

কড়ি ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কহিল—আমি তা হলে বরং রমাকে ডেকে একবার—।

মহেন্দ্রবাবু কথাটা কানেই তুলিলেন না। তিনি ডাকিলেন—কানাই, দরজাটা বন্ধ করে দে। তুমি বেরিয়ে এস গাঙ্গুলী। আর কানাই,—শোন্!

মৃদুস্বরে কানাইকে কহিলেন—একটা চাপরাসীকে বলে দে, মেয়েডাক্তারের বাড়িতে পাহারা থাকতে। ও বোধহয় পালাবে।

নলিনী আপনার নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে বসিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল। রমা এক-পাশে নীরবে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

নলিনী কহিল—ওই ব্র্যাকেটের ওপর থেকে ফুলদানী দুটো দিতে পার ভাই? আর ওই ছবিখানা? না ওখানা নয়, ওটা বাবুর ছবি। ওই যে পাশেই খোকাবাবুর ছবি—ওইখানা।

নলিনী ছবিখানা বাক্সে পুরিয়া তাহার উপর কাপড় ঢাকা দিল। তারপর আবার অন্য জিনিস গুছাইতে আরম্ভ করিল। রমা মৃদুস্বরে কহিল—দিদিমণি!

কাজ করিতে করিতেই নলিনী উত্তর দিল—কি?

—তুমি কি সত্যিই আজ চলে যাবে?

প্রশ্নটির মধ্যে এমন কিছু ছিল না, কিন্তু রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বাক্যের প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়াও যেন অনেক কিছু ছিল। নলিনী মুখ ফিরাইয়া রমার দিকে চাহিল।

নলিনীর উদ্যত চোখ দুটির উপর সকরুণ দৃষ্টি মিলাইয়া রমা বলিল—আমার কি হবে দিদিমণি!

প্রশ্নটির অভ্যন্তরের প্রচ্ছন্ন হতাশার সকরুণ সুরটুকু নলিনীকে বিশেষ করিয়া স্পর্শ করিল।

সে আবার হাতের কাজ ফেলিয়া নতমুখে বোধহয় এই প্রশ্নেরই উত্তরের সন্ধান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ রমা?

ম্লান হাসিয়া রমা কহিল—হাজার বোকা হলেও আমি তো মেয়েমানুষ দিদিমণি।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও নলিনী আপন মনে ভাবিতেছিল, এই পৃথিবীর বুকের উপর সে অতি বাস্তব উলঙ্গ সত্য সুকঠোর ভাবে শুনাইয়া দিয়া দয়া মায়া স্নেহ প্রেম সব যে মেকী তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেও ঠিক সেই পথটি অতি সূক্ষ্ম রেখায় রেখায় অনুসরণ করিবে, কিন্তু রমার এ প্রশ্নের উত্তরে সে-পথ ধরাইয়া দিতে সে পারিল না। সে নিজেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

রমা কহিল—দিদিমণি?

—ভাই!

—কি হবে আমার?

—সেই কথাই তো ভাবছি বোন। কিন্তু কূল-কিনারা খুঁজে যে কিছু পাচ্ছি না।

—আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল না দিদিমণি। আমি তোমার কেনা ঝিয়ের মত থাকব।

একটু চিন্তা করিয়া নলিনী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—না। তোমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মত শক্তি আমার নেই। এখানে এলে বের হয়ে যাওয়া সহজ কথা নয় ভাই। আমিও আজ ছ-মাস ধরে পথ খুঁজছি। আজ তুমি এসেছ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে যদি পথ পাই! তবুও সে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই।

তারপর ঘরখানি নীরব নিস্তব্ধ। কূলহারা দুটি নারী—অসীম শূন্যতার মধ্যে আজও যাহার সন্ধান হয় নাই, বাক্যে যাহাকে প্রকাশ করা যায় না, মন যাহাকে কল্পনা করিতে পারে না—রূপহীন—আকারহীন এক আশ্রয়ের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, বোধ করি তাহারই জন্য কয় ফোঁটা জল রমার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

কানাই খানসামা আসিয়া কহিল—এই যে তুমি এখানে রয়েছ! তোমাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলী মশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

গাঙ্গুলীর নাম শুনিয়া রমা বুঝিল কথাটা বলা হইয়াছে তাহাকেই, সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কই, কোথায় কাকাঠাকুর?

কানাই কহিল—এখানে কি এসেছে সে! সে আছে ওদিকের ঘরে বসে। আমার সঙ্গে এস তুমি।

রমা উঠিয়াছিল, কিন্তু নলিনী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—বস তুমি রমা। কানাই, যাও, তুমি গাঙ্গুলী মশাইকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

সবিস্ময়ে কানাই বলিল—এখানে!

—হ্যাঁ, দোষ কি? এটা তো আমাদের অন্দর নয়, আমাদের বাসা এটা। আমি তো সকলের সামনেই বের হই।

কানাই আমতা আমতা করিয়া কহিল—কি সব ওদের ঘরোয়া কথা !—

—তা হোক, আমি সরে যাচ্ছি ও-ঘরে। যাও, তুমি তাকে এখানেই পাঠিয়ে দাও। রমা এখন যেতে পারবে না, ওকে আমার দরকার আছে।

কানাইকে যেন অগত্যাই যাইতে হইল। রমা নলিনীকে পরম আশ্বাসভরে কহিল—আর আমার কোন ভাবনা নাই দিদিমণি, আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে চলে যাব।

নলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটি অদ্ভুত হাসি হাসিয়া কহিল—তোমাকে না দেখলে ভগবান যে সরল সে আমি বিশ্বাস করতাম না।

মৃদু হাসিয়া রমা কহিল—কেন দিদিমণি ?

প্রত্যুত্তরে নলিনী শুধু হাসিল।

কানাইয়ের গলা বাহির হইতে শোনা গেল—আসুন, এদিকে আসুন।

তাহার পেছন পেছন বারান্দার মোড় ঘুরিয়া গাঙ্গুলী দেখা দিল। রমাকে সম্মুখে দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—এই যে রমা ! বেশ ভাল লাগছে তো ? তারপর—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, নলিনীকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বাইশ-তেইশ বছরের শ্যামবর্ণের মেয়েটি তো হেলা করিবার মত নয়। না থাক তাহার রমার মত রূপ, কিন্তু এ যে সম্ভ্রম করিবার মত নারী, মণিবেদীর উপর এই তো শোভা পায়। গাঙ্গুলী ব্যাপারটা বুঝিল। এখানে প্রয়োজন রূপসী দাসীর। সঙ্গে সঙ্গে অল্পক্ষণ পূর্বের একটা কথাও মনে পড়িল, বাবু বলিতেছিলেন— না, এই মানুষই ভাল গাঙ্গুলী। এদের অধিকার-বোধ নেই, এরা জীবনে শুধু দুঃখ করেই সন্তুষ্ট।

বাবুর বুদ্ধির উপর শ্রদ্ধার পরিমাণ তাহার বাড়িয়া গেল। দৃপ্তা নারী পুরুষের জীবনে একটা অশান্তি—এ বিষয়ে গাঙ্গুলী ভুক্তভোগী।

গাঙ্গুলীর চমক ভাঙিল নলিনীর কথায়। একটি নমস্কার করিয়া সে কহিল—আপনি এই ঘরে রমার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি গাঙ্গুলী নমস্কারের ত্রুটিটা সারিয়া লইয়া কহিল—না—না—না। আপনার যাবার কোন দরকার নাই। বরং আপনি থাকাই ভাল। ভালই হবে, সে ভালই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিজেই যেন তাহার ফলোপলব্ধি করিতেছিল। তারপর সে কানাইয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—তুমি তা হলে কানাই—তা হলে—

কানাইকে চলিয়া যাও বলিতে সাহস হইল না। কিন্তু সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে ভাবটা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। কানাই তাহা গ্রাহ্যই করিল না।

নলিনী এটা লক্ষ্য করিল। সে কহিল—যাও না কানাই এখান থেকে। তোমায় উনি যাবার জন্য বলছেন।

কানাই হাসিয়া কহিল—আমার কাছে গাঙ্গুলী মশাই লুকোন না কিছু।

নলিনীর অসহ্য বোধ হইল। সে তীক্ষ্ণস্বরে কহিল। তবু উনি আজ তোমায় যাবার জন্য বলছেন। না তোমার হুকুম আছে যে এখনে কেউ গোপন কথা কইতে পাবে না !

কানাই নলিনীর এই উত্তেজিত তীক্ষ্ণ ধরনটিকে বড় ভয় করিত। নলিনীর কথায় অপ্রস্তুতের মত সে পালাইয়া বাঁচিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাঙ্গুলী একরূপ কানাইয়ের পিঠের উপরেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, কহিল—লুকিয়ে কথা শোনা এখানকার লোকের একটা স্বভাব। এ বাড়ির তো সব বেটা গোয়েন্দা পুলিস। আশ্চর্য দস্তুর কিন্তু!

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আপনাদের এখানে অনেক আশ্চর্য রকমের দস্তুর আছে দেখতে পাই। মানুষ কেনা-বেচা পর্যন্ত হয় দেখছি।

এমনধারা বাঁকা অথচ পরিষ্কার কথা গাঙ্গুলী কখনও শোনে নাই।

সে মহা লজ্জিত অপরাধীর মতই কহিল—সত্যিই আমার অপরাধের অন্ত নাই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার অনুতাপের আর সীমা নাই। আর এমন যে হবে তা আমি বুঝতে পারি নি। বাবু যে ভদ্রলোক হয়ে এত বড় পাষণ্ড! ছি—ছি—ছি! আমায় বললেন, গাঙ্গুলী, সভ্য মানুষ ওরা, ছেলে মানুষ করা ওদের পোষায় না—তুমি যদি একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখে—ঈশ্বরের দিব্যি—মা ভদ্রকালীর পুষ্প ছুঁয়ে আমি বলতে পারি, বুঝলেন! আপনার ভাতে হাত পড়বে—

নলিনী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—আমার সঙ্গে কথা কইবার তো কোন প্রয়োজন নাই আপনার। রমাকে কি বলবেন বলুন আপনি! আমি ও-ঘরে যাচ্ছি।

জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—গেলে তো চলবে না মা। সন্তানকে এ পাপ থেকে যে উদ্ধার করতেই হবে। চাষা-ভূষা মানুষ, কথার দোষ ধরলে তো চলবে না, মা।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—আমার কি হবে কাকাঠাকুর?

গাঙ্গুলীর গলা যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল, ঘোলাটে চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল, সে কহিল—তাই তো মা রমা, তোর কি উপায় করি আমি!

রমা ব্যাকুলভাবে কহিল—আমায় এখান থেকে নিয়ে চল বামুনকাকা।

ব্যগ্রভাবে কড়ি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—পারবি? পারবি এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে রমা? একবার যদি বেরুতে পারিস তুই এখান থেকে—তারপর আমি দেখে নেব। এমন লুকিয়ে রাখব তোকে। হুঁ-হুঁ বাবা, আমারও নাম কড়ি গাঙ্গুলী।

—কেমন করে যাব কাকা?

—এই এই এঁকে ধর। উনিই যদি পারেন কোনরকমে। বুদ্ধি দেখছিস না—তেজ দেখছিস না?

নলিনী কহিল—মাপ করবেন। আমি বোধ হয় আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মাপ করার অনুরোধটা কড়ি বোধ হয় শুনিতেই পায় নাই, সে উত্তর করিল—আজই তা হলে ওকে এখান থেকে কোনরকমে বার করে দিন, আপনার যাবার আগেই। ভালই হয়েছে, আমিও আছি এখানে আজ।

সঙ্গে সঙ্গে রমাও মিনতি করিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি দিদিমণি।

বাহিরে রুদ্ধ দ্বারে কে আঘাত করিল।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া কড়ি কহিল—নিশ্চয় শালা কানাই, লুকিয়ে শুনেছে বেটা সব। বিকৃত মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, বিচ্ছিন্ন দন্তপাটী বিচ্ছিন্ন হইয়াই রহিল। নলিনী অগ্রসর হইয়া দুয়ারটা খুলিয়া কহিল—কে ?

দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল সুবোধ বালকের মত সেই কেরানীবাবুটি। একখানি পিওন-বই নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া কহিল—চিঠি আছে একখানা।

সই করিয়া দিয়া চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া নলিনী ঈষৎ হাসিল।

কেরানীবাবু কহিল—এর পর জবাব আদান প্রদান তো আদালত মারফতেই হবার কথা। আজ্ঞে বিবেচনা করে দেখলে একবার ভাল হয়।

নলিনী নতমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর কহিল—তাই হবে। আমার চুক্তির সময় আমি শেষ করেই দিয়ে যাব।

কেরানী কহিল—তা হলে তাই গিয়ে বলি বাবুকে ?

—বলবেন।

কেরানীবাবু চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলীর আর থাকিতে সাহস হইতেছিল না। সে মৃদুস্বরে কহিল—আমিও তাহলে যাই, বুঝলেন ? বেটা সরিঙ্গী আবার দেখে গেল। ওই যে দেখছেন সরিঙ্গী চেহারা আর কান্না-কান্না মুখের ভাব—ও শালা একেবারে টিপে ষষ্ঠী—ছেলে খান দশটি। বিশ্বাস নাই বেটাকে। তাহলে আজই কোনরকমে—বুঝলেন কিনা, তারপর আমি বুঝে নেব।

সে আর দাঁড়াইল না। চিরাভ্যস্ত দ্রুত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। কানাই দরজার পাশেই ছিল। গাঙ্গুলী তাহাকে দেখিবামাত্র কহিল—বাবা, এ কড়ি গাঙ্গুলীর ভেল্কি! মেয়ে-ডাক্তারের মত ফিরে গেল—সে থেকে গেল। বললাম, বাবা এত সুখ-ঐশ্বর্য পাবে কোথায় ?

কানাই সে কথার কোন জবাব দিল না, কহিল—বাবু ডেকেছেন আপনাকে।

কড়ির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ব্যগ্রভাবে কহিল—কেন রে, কেন ?

—সে আমি জানব কি করে বলুন দেখি ?

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আমি বেশ বুঝেছি—এ তুই বেটা দুম্মুখের কাজ।

তারপর চলিতে চলিতে সে আপন মনেই বলিল—যেমন রাজা রামচন্দ্র তেমনি হয়েছে চর দুম্মুখ। যাবেন লক্ষ্মী পাতালে। আমার করবি ধেঁচু—আমি থোড়াই কেয়ার করি। কড়ি গাঙ্গুলীরও তেজারতি চল্লিশ হাজার, সে বাবা তোবলা-মোবলা নয়। আর ভগবান এত লোককে নেন—এ বেটাকে নেয় না গো!

কানাই তখন অনেকটা পিছনে একটা চাপরাসীকে হাত-মুখ নাড়িয়া কি বুঝাইতেছিল সে সংবাদ গাঙ্গুলীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। আড়চোখে আশপাশ দেখার একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল তাহার।

রমা কহিল—কোন রকমে আমাকে এখান থেকে বের করে দাও দিদিমণি। আমি কাকাঠাকুরের সঙ্গে—

নলিনী কহিল—না রমা, বাঘের মুখ থেকে অজগরের মুখে তুলে দিতে সাহায্য আমি করতে পারব না। এখানে থাকলে দুমুঠো খেতে তুমি পাবে, কিন্তু কড়ি গাঙ্গুলীর হাতে পড়লে জীবনে কোন দুঃখ হতেই নিষ্কৃতি তুমি পাবে না।

তারপর চোখ দুটি তুলিয়া সকরুণভাবে রমা কহিল—তবে আমার কি হবে দিদিমণি?

হাসিয়া নলিনী কহিল—ভয় কি ভাই, তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে নিজেকে জড়ালাম আমি। তাতে আমার ভাগ্যে যা থাকে থাক।

রমা ব্যগ্রভাবে কহিল—তাই তুমি যাচ্ছ না দিদিমণি?

নলিনী কহিল—হ্যাঁ। তারপরেই ডাকিল, কানাই, কানাই!

কানাই তখনও চাপরাসীটার সহিত কথা কহিতেছিল। নলিনীর ডাকে সে আসিয়া দাঁড়াইতেই নলিনী বাক্স খুলিয়া কয়খানা গহনা তাহার হাতে দিয়া কহিল—এই গয়নাগুলো খাজাঞ্চীর কাছে জমা রেখে এস তো। একটা রসিদ এনো যেন।

কানাই কহিল—আপনি তা হলে যাচ্ছেন না, কেমন দিদিমণি?

বিষণ্ণভাবে নলিনী কহিল—এখনও আমার অদৃষ্টের ভোগ যায় নি কানাই, চুক্তির সময় পার হয় নি। কিন্তু ও চাপরাসীটা ওখানে কেন? আমার ওপর পাহারা পড়েছে বুঝি?

কলরব করিয়া কানাই কহিল—দেখুন দেখি, কি যে বলেন আপনি! এই বেটা ভূত, হিঁয়া কাঁহে বসকে রতা হ্যায়? ভাগ ভাগ হিঁয়াসে!

ঘরের দেওয়ালের ব্র্যাকেটের ওপর একটা টাইমপিস টিক্ টিক্ করিয়া চলিতেছিল। নলিনী সেটার দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। নির্বাক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে রমা কখন মেঝের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নলিনী বাহিরের বারান্দায় বাহির হইয়া গেল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে দিবসান্তের নিষ্ক্রিয়তা ঘনাইয়া উঠিতেছে। দূরে শুধু কয়টা ছাগল তখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নলিনী চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘুমন্ত রমাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল।

নিদ্রাভঙ্গে রমা চকিতের মত উঠিয়া কহিল—কি দিদিমণি?

—এস, উঠে এস।

—কোথায়?

—এস না আমার সঙ্গে। একটু মাঠের দিকে যাব। ঘরের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছে।

রমা গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া নলিনীর পিছন ধরিল।

সূর্য তখন অস্ত গিয়াছে। অতলের অন্ধকার মাটির বুক ভেদ করিয়া অস্তরাগদীপ্তি আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির সীমানার শেষপ্রান্তে বাগান-ঘেরা পুকুরটার মধ্যে ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দু-পাশের ছোট ছোট আমগাছগুলির মধ্যে দিয়া পায়ে-চলা সরু পথখানি ধরিয়া নলিনী আসিয়া দাঁড়াইল পুকুরটির এ-প্রান্তে। তারপর কাঁটাতারের বেড়াটা কোনরূপে পার হইয়া একেবারে মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

রমা বিস্মিত হইয়া কহিল—আর কোথা যাবে দিদিমণি?

নলিনী কহিল—স্টেশনে। এই পথ ধরে গেলেই সোজা হবে—ওই দেখ সিগনালের আলো দেখা যাচ্ছে।

—স্টেশনে কেন যাবে?

—এই ট্রেনেই আমরা কলকাতা যাব।

রমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। সে কহিল—আবার কবে ফিরে আসবে?

—আবার কি ফিরে আসে রমা! লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছ না?

—কিন্তু তোমার জিনিসপত্তর গয়না-কাপড় সব যে পড়ে রইল!

বিরক্তিভরেই নলিনী কহিল—থাক। বেশী কথা তুমি কয়ো না রমা—কে কোথায় শুনতে পাবে।

নীরবে দ্রুতপদেই তাহারা চলিয়াছিল। কিন্তু রমা অকস্মাৎ আবার বলিয়া উঠিল—অত সুন্দর কাপড়গুলো—গয়না—আক্ষেপের একটা দীর্ঘনিশ্বাস বোধ করি আপনি তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল।

চলিতে চলিতেই নলিনী বলিল—ও-গুলো তুমি নেবে রমা?

রমার লজ্জা হইল, সে চুপ করিয়া রহিল। নলিনী আবার কহিল—ও-গুলো সব তোমাকে আমি দিতে পারি।

বিস্মিত কণ্ঠে একটা বিচিত্র স্বরে রমা বলিয়া উঠিল—সমস্ত!

—সমস্ত, সমস্তই তোমাকে আমি দিচ্ছি রমা। তুমি একটা কাজ কর।

এবার রমা যে স্বরে উত্তর দিল—সে স্বর কিন্তু পূর্বের স্বর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অকস্মাৎ যেন সে কেমন হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিষণ্ণভাবে সে কহিল—ওসব নিয়ে আমি কি করব দিদিমণি!

নলিনী বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করিল—কেন—গয়না পরবে।

ম্লান কণ্ঠেই রমা উত্তর দিল—আমি যে বিধবা দিদিমণি।

নলিনী এ কথার জবাব দিতে পারিল না। একটি সকরুণ বেদনায় তাহার মন ভারাক্রান্ত

হইয়া উঠিল—লজ্জাও হইয়াছিল। না ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন একটি প্রশ্ন করার জন্য মনে তাহার গ্লানির অন্ত ছিল না। দুইটি নারীই ইহার পরে নীরবে চলিয়াছিল। সকরুণ নিঃস্বতার মধ্যে যেন সমস্ত কথার উপাদান হারাইয়া গিয়াছে।

স্টেশনে আসিয়া নলিনী রমাকে লইয়া প্লাটফর্মের একপ্রান্তে অন্ধকারপ্রায় একটি স্থানে বসিয়া কহিল—বেশী কথাবার্তা বলো না রমা; রেলে না চড়লে বিশ্বাস নেই।

তখনও ট্রেন আসতে খানিকটা বিলম্ব ছিল। এদিকে ওদিকে দুই-চারিটি যাত্রীর দল বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। স্টেশনের বাহিরে একটা চায়ের দোকানে একটা ছোঁড়া হাঁকিতেছিল—চা গরম—বাবু বিড়ি পান!

কোন গাড়ির একটি গরু কখন দড়ি খুলিয়া পলাইয়াছে—গাড়োয়ানটা গরুটাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমাগত তাহাকে গাল দিতেছিল—এমন শালার বে-আক্কেলে গরু তো আমি দেখি নাই!

কাহাদের একটি বউ আসিয়া রমাদের অনতিদূরে বসিল। পেটরাটি নামাইয়া সঙ্গের পুরুষটি কহিল—বস তুমি এইটার ওপর—আমি পান বিড়ি লিয়ে আসি।

রমা নলিনীকে চুপি চুপি কহিল—বউটির সঙ্গে আলাপ করব দিদিমণি?

অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়—নলিনী দৃষ্টি হানিয়া বসিয়াছিল লাইনের ধারে।

সে রমার কথায় মুখ ফিরিইয়া কহিল—না। বস চুপ করে।

নলিনীর মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল একটি বিষণ্ণ চিন্তার ধারা, সেই চিন্তাতে আবার সে নিমগ্ন হইয়া গেল। টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই নলিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিল—তুমি বস রমা, আমি টিকিট করে আনি।

টিকিট-ঘরের জানালার ধারে নলিনী একখানা দশ টাকার নোট আগাইয়া দিয়া কহিল—দুখানা হাওড়ার টিকিট দেবেন তো।

চুড়ি-পরা মসৃণ-ত্বক হাত দেখিয়া আর কণ্ঠস্বর শুনিয়া টিকিটবাবুটি আলোটি জোর করিয়া দিলেন। জানালার জালতির গায়ে নাকটা চাপা পড়িয়া চ্যাপটা হইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি কহিলেন—কোথাকার?

তাঁহার অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়া নলিনী মনের এই অবস্থাতেও না হাসিয়া পারিল না। সে কহিল—হাওড়ার।

—একখানা?

—না—দুখানা।

টিকিটের আলমারির খোপে খোপে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি হাওড়ার টিকিট অনুসন্ধান করিতেছিলেন—আর মুখে বলিতেছিলেন—হাওড়া হাওড়া হাওড়া।

অকস্মাৎ আবার তিনি জালতির গায়ে নাক চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন্ ক্লাস?

—থার্ড ক্লাস।

—হুঁ—থার্ড ক্লাস—হাওড়া হাওড়া। খুঁজিতে খুঁজিতে নলিনীর ভাগ্যক্রমে টিকিট

* *

পাওয়া গেল। টিকিট দুখানা লইয়া নলিনী রমার কাছে আসিয়া কহিল—উঠে এস রমা।

—দাঁড়ান আপনি।

নলিনী চমকিয়া উঠিল, প্লাটফর্মের আলোগুলো তখন সবেমাত্র জ্বলিতে শুরু করিয়াছে—সেই আলোতে নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল দুটি লোক। একজন পুলিসের পোশাক পরা ভদ্রলোক, অপরজন মহেন্দ্রবাবুর মোকদ্দমা সেরেস্তার কর্মচারী মিত্তির মশায়।

নলিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া সে কহিল—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ।

নলিনী নীরবে তাহাদের বক্তব্যের অপেক্ষা করিল।

পুলিশ কর্মচারীটি কহিল—আপনার বিরুদ্ধে একটা চার্জ আছে। আপনি এখানকার হাসপাতালের যন্ত্রপাতি আর মহেন্দ্রবাবুর বাড়ির কিছু টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

নলিনীর মনে হইল পায়ের তলা হইতে মাটিটা যেন সরিয়া যাইতেছে। সে এ আশঙ্কা করে নাই। অপর যে কোন অভিযোগ শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই চুরির অভিযোগ তাহার কল্পনাতীত। এ যুগে যে এর চেয়ে ঘৃণ্য অভিযোগ আর কল্পনা করা যায় না।

কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করিল—কেউ কারও নামে চুরির অভিযোগ করলেই কি আপনারা তাকে অ্যারেস্ট করে থাকেন?

দারোগা কহিল—হ্যাঁ, তাই নিয়ম। অবশ্য চুরি যে হয়েছে তার সন্তোষজনক প্রমাণ দেখিয়ে আমাদের বিশ্বাস করাতে হবে। তারপর ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার গৃহস্থের বা অভিযোগকারীর থাকবে।

—ও। দেখুন আমারও আজ গয়না চুরি গেছে। আমি জানি সে গয়না মজুত আছে এখানকার মহেন্দ্রবাবুর খাজাঞ্চীখানার সিন্দুকে।

এবার কথা কহিল মিত্তির মশায়—বাবুর মোকর্দমা সেরেস্তার কর্মচারীটি—কবে আপনার গয়না চুরি গেল?

—আজই।

—সে সংবাদ আপনি পুলিসে দেন নি কেন?

—আমার ইচ্ছা হয় নি।

মৃদু হাসিয়া কর্মচারীটি কহিল—এও যে একটা মস্ত বড় অফেন্স আপনার। এর জন্যও পুলিস কেসে পড়তে হবে আপনাকে।

নলিনী কঠিন হাসি হাসিয়া কহিল—অর্থাৎ অপরাধ যত কিছু সবই আপনাদের রচনায় আমাকেই পাকে পাকে ধরেছে। বেশ—এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন?

দারোগা কহিল—আমার সঙ্গে আপনাকে আসতে হবে। আসুন।

—চলুন। এস রমা।

রমা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ওদিকে ট্রেনটা আসিয়া পড়িয়াছিল। যাত্রীর কলরবে স্টেশন প্লাটফর্মটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নলিনী ও রমাকে লইয়া স্টেশন ঘরের মধ্যে পুলিস কর্মচারীটি তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল।

—আপনার জিনিসপত্রগুলো একবার দেখতে চাই আমি।

নলিনী দৃপ্ত ভাবেই উত্তর দিতেছিল। সে উত্তর দিল—জিনিসপত্র তো সঙ্গে কিছু নেই আমার। থাকবার মধ্যে আমার পরনে যা রয়েছে—তাই। এর মধ্যে কি কিছু লুকিয়ে রাখতে পারি বলে আপনার মনে হয়?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—অন্য জিনিস না থাকতে পাবে—কিন্তু টাকা কি নোট বা গয়না এ-সব;—না কি বলছেন দারোগাবাবু, এ্যাঁ?

সভয় বিস্ময়ে নলিনী চমকিয়া উঠিল, বলিল—আপনার কি আমার দেহ তল্লাস করে দেখতে চান?

মিত্তির মশায়ই জবাব দিল—আইন তো তাই বটে। তার আর আমরা কি করব বলুন—এ্যাঁ—না কি বলছেন দারোগাবাবু?

নলিনী স্টেশনঘরের টেবিলটার উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুর লজ্জা গোপন করিল। জীবনে লজ্জাকর বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের যখন কোন উপায় থাকে না—তখন অনেক সময় সে জোর করিয়া টানিয়া আনে কৃত্রিম একটা দম্ভপূর্ণ সাহসিকতা। কিন্তু তাহার জীবন যেমন অল্প তেমনি যে মূল্যহীন। মুহূর্তে মুহূর্তে স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত সে ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। নলিনীরও ঠিক এমনি একটি অবস্থা আসিয়াছিল। সে টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া উদ্যত ক্রন্দন সম্বরণের চেষ্টা করিতে চাহিল।

বাহিরে একটা ছোঁড়া ফিরি করিয়া ফিরিতেছিল—গরম চা—চা গরম বাবু।

দারোগা হাঁকিল—এই বেটা চা গরম—এই! দে তো এখানে চা দু কাপ। আপনি খাবেন চা? আমাদের লেডি ডাক্তারকে বলছি।

নলিনী টেবিলের উপরেই মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল।

মিত্তির মশায় কহিল—তবে আর দু কাপ নেবেন কেন?

দারোগা বলিল—আপনি?

গলার মালায় হাত দিয়া মিত্তির মশায় উত্তর করিল—আজ্ঞে না, চা কি পান, কি তামাক, বিড়ি কি সিগারেট ও আমি খাই না। ও-গুলো তো জীবনে নেসেসিটি নয়, না কি বলেন দারোগাবাবু? জীবনে চা খেয়েছি তিন কাপ। বুঝলেন কিনা—১২৯৫ সালে আষাঢ় মাসে। বেশ মনে আছে ২৫শে আষাঢ় আমার সর্দি করেছিল খুব—চা তখন দেশে নতুন উঠেছে, সেই একদিন এক কাপ খেয়েছি। আর সেকেণ্ড কাপ খাই এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে গিয়ে—সে হল আপনার ১৩০২ সালের ১২ই মাঘ। রাত্রে পড়তে পড়তে ঘুম আসছিল, সেদিন খাইয়েছিল

আমাদের ক্লাস ফ্রেণ্ড—হরগোবিন্দ সেন—সে এখন মুন্সেফ।

দারোগা কহিল—জানি তাঁকে আমি, হুগলিতে ছিলেন তিনি—

সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—ছিল— বোধ হয় নাইন্টিন এইট থেকে নাইন্টিন ইলেভন পর্যন্ত হুগলিতে ছিল হরগোবিন্দ। সেই দিন আমাকে খাইয়েছিল। আর একদিন বর্ষায় খুব ভিজে জিয়াগঞ্জ স্টেশনে এক কাপ চা কিনে খেয়েছি। সে বোধ হয় ১৩২৭ সালের শ্রাবণে—১৬ই শ্রাবণ। তা নইলে আমি জীবনে চা কখনও খাই নি। দোকানের মিষ্টিও কখনও খাই নি আমি—মিষ্টির মধ্যে বাতাসা আর গুড়। হোটেলেও ভাত কখনও খাই না, যেখানে যাই আলু-ভাতে-ভাত—ওই একপাকে যা হল আর কি—তাই খাই। আমার ব্যাগে সব থাকে—চাল, ডাল, আলু, নুন, মসলা—শিশিতে তেল—

দারোগা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাহলে ব্যাগও তো আপনার মস্ত বড়। চামড়ার—

জিভ কাটিয়া মিত্তির মশায় বলিল—রাম রাম—ক্যাম্বিসের, চামড়ার জুতোই আমি পায়ে দিই না। ক্যাম্বিসের—

মিত্তির মশায়ের কথায় একটা বাধা পড়িল। একজন আগন্তুক দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—মাস্টার মশায়, টিকিটটা কাকে দেব? কেউ নেই তো গেটে।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোক পরিপূর্ণভাবে আগন্তুকের দেহের উপর পড়িয়াছিল। একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক—গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ তাহার, শুভ্র একটি পাঞ্জাবিতে তাহাকে মানাইয়াছিল বড় চমৎকার।

দারোগা তাহাকে দেখিবামাত্র নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিল—নমস্কার সঞ্জীববাবু, এই ট্রেনে নাকি?

সঞ্জীবও প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল—নমস্কার। আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ট্রেনেই এলাম জামালপুর থেকে। তারপর আপনারা কোথায়?

দারোগাবাবু কোন উত্তর দেবার পূর্বেই মিত্তির মশায় চেয়ার ছাড়িয়া বিলক্ষণ হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল—প্রণাম। ভাল আছেন সঞ্জীববাবু?

প্রত্যুত্তরে সঞ্জীব ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যভিবাদন করিয়া কহিল— প্রণাম। হ্যাঁ ভালই আছি। তারপর আপনি কেমন?

ভদ্রলোক একেবারে আঁতকাইয়া উঠিলেন, অদ্ভুত ভঙ্গিতে কহিলেন—রাধে, রাধে, রাধে। ই—কি ব্যবহার মশায় আপনার, ই—কি ব্যবহার মশায়? ই তো ভাল নয়? আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র—

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—প্রণাম করলে আমি প্রণামই করে থাকি মিত্তির মশায়। কারও প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি না।

মিত্তির মশায় অবজ্ঞাভরে কহিল—এ-সব হল আজকালকার ফ্যাশান—না কি বলেন দারোগাবাবু? বাঙালীর মত ফ্যাশানের দাম আর কোনও জাতে নাই। অ্যাঁ—না কি বলেন দারোগাবাবু—অ্যাঁ?

সঞ্জীব উত্তর দিল—সেইটেই বাঙালীর জীবনে বড় ভরসার কথা মিত্তির মশায়। সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে পারে, নতুনকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে পারে—এমনি জাতই পৃথিবীকে ভবিষ্যতে নতুন কিছু দিতেও পারে। যাক, মাস্টার মশায় গেলেন কোথায়? টিকিটখানা দিই কাকে?

মিত্তির মশায় কিন্তু কথাটা এত সহজে ভুলিতে পারিল না। সে কহিল—আচ্ছা আপনি জাত মানেন না?

—না।

—তবে পৈতে রাখেন কেন আপনি গলায়?

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—পৈতে তো রাখি না।

—রাখেন না?

—না।

—আপনি তা হলে অতি—অতি—। যোগ্য বিশেষণ বোধ হয় মিত্তির খুঁজিয়া পাইল না।

সঞ্জীব কৌতুকভরে কহিল—অতি অতি—তারপর কি বলুন মিত্তির মশায়।

দারোগাও মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। মিত্তির মশায়ের অঙ্গ কিন্তু জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—জানি না মশায়, যান। বামুনকে গাল দিয়ে আমি পাপের ভাগী হই আর কি! না কি বলেন দারোগাবাবু, অ্যাঁ? নাইন্টিন ফোরে বর্ধমানে রমেশ চ্যাটুজ্যে উকিল ব্রাহ্মধর্ম যখন নেয়, বুঝলেন কিনা, তখন এমনি একদিন আমার সঙ্গে মহা তর্ক। আমি বলেছিলাম, মশায়, এর পর বুঝবেন—এখন রক্তের তেজ আছে—এর পর বুড়ো বয়সে বুঝবেন। হয়েছেও তাই—গত বৎসর মাঘ মাসে, বোধ হয় ৮ই তারিখে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কত দুঃখই করলেন রমেশবাবু, বললেন, মিত্তির মশায়, এ হয়েছে আমার সাপের ছুঁচো গেলা, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে গেলাম।

সঞ্জীব টিকিটখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া কহিল—থাক টিকিটখানা এইখানেই। আমি যাই, রাত্তির হচ্ছে।

দারোগা অনুরোধ করিয়া বলিল—আরে বসুন না মশায়, যাবেনই তো। চা খান এক কাপ।

এই—এই বেটা চা-গরম!

বাধা দিয়া সঞ্জীব কহিল—থাক, দরকার হবে না দারোগাবাবু। অনর্থক ব্যস্ত হবেন না আপনি।

দারোগাবাবু প্রশ্ন করিল—তারপর কদিন থাকবেন এখানে? করছেন কি আজকাল?

এ প্রশ্নে সঞ্জীব হাসিয়া ফেলিল। কহিল—একটা কথা মনে পড়ে গেল দারোগাবাবু। একজনের গাড়ি মেরামতের দরকার হয়েছিল, পথে কামারকে দেখে পথেই ধরেছিল যে এটা তুমি এইখানেই মেরামত করে দিয়ে যাও।

দারোগাও হাসিয়া উঠিল—তারপর বলিল—মাপ করতে হবে সঞ্জীববাবু—যে উদাহরণটা দিলেন ও অভ্যেস এ সংসারে একটা লোক বাদ দিয়ে বোধ করি ন'শো নিরানব্বই জনের। কে বেশী খাটতে চায় বলুন ?

সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে—

বাধা দিয়া দারোগাটি কহিল—থাক সঞ্জীববাবু, প্রশ্ন আমি বুঝেছি। কিন্তু এ প্রশ্ন আপনার কাছে প্রত্যাশা করি নি। পৃথিবীতে চিরদিন নতুন এবং সবলকে সন্দেহ বা চোখে চোখে সবাই রেখে এসেছে, এবং ভবিষ্যতেও বোধ করি রাখবে। যাকে বোঝা যায় না সেই এ সংসারে আশঙ্কার বস্তু।

—যাক ও কথা মশাই—ও আলোচনায় ফল নেই। আপনার কথার বরং উত্তর দিই। এখন এখানে কিছুদিন থাকব। মায়ের শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না—তার ওপর বয়সও হয়েছে তাঁর, কোন্ দিন হয়ত মারা যাবেন, শেষ মুহূর্তে দেখা হবে না—বা হয়ত সৎকারই হবে না।

চট করিয়া মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—মা মারা গেলে কি করবেন আপনি—কোন্ মতে সৎকার করবেন ?

সঞ্জীব বলিল—কথাটা আপনি এখনও ভোলেন নি দেখছি। মায়ের সৎকার আমার হিন্দু মতেই করতে হবে, কারণ মা আমার নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তাঁর অভিপ্রায় এবং তাঁর ধর্মপদ্ধতি অনুযায়ী, তাঁর সৎকার হওয়াই সঙ্গত। নইলে সৎকার যে কোন মতে করতে আমার বাধা নাই। যে কোন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বা সৎকারে আমি যোগ দিতে পারি বা দিয়ে থাকি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিল—তারপরে কহিল—বেশ লাগে আমার অন্ধকার রাত্রে নির্জন বসতিহীন প্রান্তরে জলন্ত চিতার উপর শবদাহ দেখতে। চোখের ওপর দেহখানা ছাই হয়ে যায়—জলন্ত আগুনের উপর থাকে শুধু ওই সত্যটি আর চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে লীন হয়ে যায় স্বার্থপর সংসার।

অকস্মাৎ সে হাসিয়া কহিল—বড্ড বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে গেছি দেখছি। থাক, চলি দারোগাবাবু।

নলিনী মুখ তুলিয়াছিল—অশ্রুর চিহ্ন তখনও মুখে পরিস্ফুট রূপে দেখা যাইতেছিল। সে কহিল—একটু দাঁড়ান !

সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া কহিল—আমাকে বলছেন ? আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে আগে—ও, আপনি লেডি ডাক্তার না ?

নতমুখে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। বড় বিপদে পড়ে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

সঞ্জীব দারোগার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—দারোগা বোধ হয় প্রস্তুতই ছিল—

সে বলিল—আপনার বোধ হয় এর মধ্যে থাকা উচিত হবে না সঞ্জীববাবু। এঁর বিরুদ্ধে চুরির চার্জ দিয়ে ডায়েরী করেছেন মহেন্দ্রবাবু।

নলিনী উত্তেজিত ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না—না—মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। আমি আর যাই হই চুরি করতে আমি পারি না। আমায় আটকে রাখতে চায়

এরা। সে আর কিছু বলিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

সঞ্জীব দারোগার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি চুরি করেছেন ইনি দারোগাবাবু?

মিত্তির মশায় বলিয়া উঠিল—এ আপনার ইল্‌লিগাল হচ্ছে মশায়। পাবলিক সারভেণ্টের কর্তব্যে বাধা দেওয়া বে-আইনী। নাইন্টিন টোয়েনটি নাইনে ডিসেম্বরের রেকর্ড খুলে দেখবেন সিমিলার কেস এই থানাতেই হয়েছে।

সঞ্জীব সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না, সে দারোগাকেই প্রশ্ন করিল—কি চার্জ দারোগাবাবু?

দরোগা বলিল—হাসপাতালের ইনস্ট্রুমেণ্ট আর কিছু নগদ টাকা ইনি নাকি চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতা।

—সে-সব জিনিস কি এঁর কাছে পাওয়া গেছে?

—না। তবে কিছু টাকা—একখানা দশ টাকার নোট স্টেশন মাস্টারের কাছে পেয়েছি, ইনি টিকিট করেছেন তা দিয়ে—নোটখানার পেছনে মহেন্দ্রবাবুর এস্টেটের স্ট্যাম্প মারা আছে।

নলিনী কহিল—সে আমার মাইনের টাকা। ওঁদের এস্টেট থেকেই মাইনে পেয়েছি আমি।

সঞ্জীব বলিল—আপনারা এখন কি করতে চান দারোগাবাবু?

দারোগা প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া উত্তর দিল—আপনি কি এঁর জামিন হতে পারবেন সঞ্জীববাবু? কেসের সময় হাজির করে দেবেন। কিন্তু এ ব্যাপারটায় আপনি হাত না দিলেই ভাল হত—বোধ হয় আপোসেই মিটে যেত। আর জানেন তো মহেন্দ্রবাবুকে—

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—জানি, সেই জন্যেই এঁর কথায় অবিশ্বাস করতে পারছি না আমি।

মিত্তির মশায় অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল—কিন্তু এই মাগীর পরিচয় জানেন?

রূঢ় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব কঠিন স্বরে কহিল—চুপ করুন আপনি।

পিছনে মনিবের জোর থাকিলে কুকুর সহজে ভড়কায় না। এত বড় জমিদারের কর্মচারী এতটুকুতে দমিল না, বলিয়া উঠিল—মাগী খৃষ্টান—

স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সঞ্জীব বলিল—আর কিছু বলবার আছে আপনার?

এই দৃষ্টিতে মিত্তির মশায় একটু দমিয়া গেল—সে ঈষৎ মৃদুভাবে বলিল—বাবুর—বাবুর রক্ষিতা—

—আর কিছু?

মিত্তির মশায়ের বাক্‌-যন্ত্রটার দম যেন ফুরাইয়া গেল, অতি শিথিল মৃদুভাবে সে কহিল—না।

ও-পাশে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া নলিনী মুখ লুকাইয়া ছিল। রুদ্ধকণ্ঠের কয়েকটি কথা ভূমিতলে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলের কানে আসিয়া পৌঁছিল—সত্যি, সত্যি।

সঞ্জীব এক মুহূর্তের জন্য নলিনীর পানে তাকাইয়া কহিল—আমি এঁর জামিন হচ্ছি দারোগাবাবু।

দারোগা উঠিয়া কহিল—আসুন তাহলে থানায়, জামিননামায় সই করে দিতে হবে আপনাকে।

জামিনের আবশ্যকীয় কাগজপত্রে সহি ইত্যাদি শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল। মিত্তির মশায় প্রয়োজনীয় বিবরণটুকু নীর হইতে ক্ষীরের মত ছানিয়া ছানিয়া ছোট নোট-বইখানিতে নোট করিয়া লইল। তারপর আসন ছাড়িয়া উঠিবার সময় সঞ্জীবকে বলিল—প্রণাম সঞ্জীববাবু, কাজটা আপনার মত লোকের যোগ্য কাজ হল। আর কি জানেন, এ কাজ মানায়ও আপনার মত লোককে।

সঞ্জীব হাসিয়া কহিল—প্রণাম। কিন্তু আপনাদের চোখেও কি আমাদের যোগ্যতা ঠেকে মিত্তির মশায়?

মিত্তির মশায় সঞ্জীবের কথা শেষ হইবার পূর্বেই লাফাইয়া উঠিয়াছিল, রাধে রাধে গোবিন্দ হে! আপনি যে কি করেন সঞ্জীববাবু, ছি-ছি-ছি! না—না রাধে রাধে—এ আপনার ভারি অন্যায় মশায়। আপনি ভারি ইয়ে।

সঞ্জীব উত্তর দিল—স্টেশনে তো এর আগে অনেক কথা হয়ে গেল, তারপর যে আপনি এমনি ভুল করে বসবেন এ আমি কেমন করে বুঝব বলুন!

মিত্তির মশায় সহসা সঞ্জীবের হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—দোহাই সঞ্জীববাবু, আমাকে আর পাপের পঙ্কে ডোবাবেন না। পায়ের ধুলো আমায় দিন। আর রহস্য করবেন না।

সঞ্জীব ধীরভাবে কহিল—আমি কি রহস্যের ভঙ্গিতে আপনার সঙ্গে কথা কয়েছি এতক্ষণ? আমার তো তা বোধ হয় না। সত্যিই আপনাকে আমি বলছি—আপনাকে আমি রহস্য করি নি—এ আমার ধর্ম। আপনার ধর্মে যেমন কতকগুলো আচার আছে, এও তেমনি আমার ধর্মের নিয়ম, আচার, আমার চেয়ে হীন বলে কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

মিত্তির মশায় তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরিত্যক্ত চেয়ারটায় আবার বসিয়া পড়িল। তারপর ঊর্ধ্বমুখে থানার চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাদের থানাটি কিন্তু বেশ চমৎকার, দারোগাবাবু। চালের কাঠামো কি! অথচ দেখুন, একশো বছরেরও বেশী দিনের ঘর। আজকাল এমন ঘর আর হয় না—না কি বলেন, অ্যাঁ?

—নবগ্রামে একখানি এমনি ঘর আছে—বুঝলেন, হারাধন চাটুজ্যের ১২২৫ সালের ঘর, অথচ এখনও কি শক্ত!

সঞ্জীব দারোগাকে নমস্কার করিয়া নলিনীকে কহিল—আসুন।

মিত্তির মশায় দারোগাকে বলিতেছিল—এরও বয়স অনেক দিনের। বড়দলে সাল-সন লেখা আছে। ১৩০৩ সালে এ থানায় আমি প্রথম আসি, বুঝলেন দারোগাবাবু, তখন

দেখেছি, বোধ হয় ১২৪৮ সাল লেখা আছে, নয় দারোগাবাবু, অ্যাঁ ?

ততক্ষণে সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া রাস্তার উপর নামিয়াছে। দারোগাবাবু মিত্তির মশায়ের কথার কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মিত্তির মশায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আগে আলোটা একবার দেন তো মশায়। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আলোটা তুলিয়া লইয়া একটা জায়গার মাটি লইয়া মাথায় বুকে বুলাইয়া লইল। ঐ স্থানটিতেই সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল। আলোটা নামাইয়া দিয়া মিত্তির মশায় কহিল—দেখুন দেখি মশায় এঁচোড়-পক্ক বামুনের ছেলের কাজ! আরে বাপু বামুনের ছেলে তুই! দেশের অধঃপতন দেখুন দেখি একবার! রাধে রাধে। ধর্ম গেলে আর রইল কি? নমস্কার দারোগাবাবু, কিন্তু কাজটা আপনি ভাল করলেন না মশায়। জামিনটা না দিলেই হত। বড় দারোগাবাবু থাকলে—

দারোগাবাবু মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—ঐ ছেলেটি বড় পাকা ছেলে মিত্তির মশায় —সাহস হল না। পরশু খবরের কাগজেই বোধ হয় যেটুকু ঘটল এ সংবাদটুকুও দেশময় রটে যাবে। নিজের মাথার দামটা নিজের কাছে খুব বেশী মিত্তির মশায়। কি বলেন আপনি?

মিত্তির মশায় আবার চাপিয়া বসিল। কহিল—যা বলেছেন মশায়। এর একটা বিহিত—

দারোগাবাবু বলিল—আপনার বাবুকে বলুন না। একটি দুগ্ধপোষ্য বালককে জব্দ করতে তিনি পারছেন না! ওরে, আমার খাবার তৈরি করতে বল তো। তাহলে—

জোড়হাতে বিনীত নমস্কারের ভঙ্গিতে ঘাড় দোলাইয়া সদর রাস্তার দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিল।

মিত্তির মশায় অগত্যা উঠিল। থানা হইতে পথে নামিতে নামিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—পড়ে ডেঁপোটা একবার একটা ফৌজদারী মামলায়!

রাস্তায় নামিয়া সঞ্জীব কহিল—তারপর আপনি এখন কোথায় যাবেন?

নলিনী অসঙ্কোচেই উত্তর দিল—আপনার বাড়ি। নইলে আর এ গ্রামে আমায় আশ্রয় কে দেবেন বলুন? আপনার পরিচয় শুনেছিলাম—দু-একবার দেখেওছিলাম—তাই স্টেশনে আপনার আশ্রয় চেয়েছিলাম। নইলে এখানে অপর কোথাও আশ্রয় নিলে ঘুমিয়ে উঠে দেখতাম যেখানকার মানুষ সেখানেই আছি।

সঞ্জীব একটু নীরব থাকিয়া বলিল—সে প্রস্তাব আমি আগেই করতাম এবং করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাতে একটু অসুবিধা—আপনাদেরই অসুবিধা হবে বলে মনে হয়।

বিচিত্র হাসি নলিনীর মুখে দেখা দিল। সে কহিল—আমাদের অসুবিধা!

—হ্যাঁ, আপনাদেরই অসুবিধা। কথাপ্রসঙ্গে শুনেছেন বোধ হয় আমার মা সেকেলে নিষ্ঠাবতী হিন্দু। তিনি হয়ত—

নলিনী বাধা দিয়া কহিল—যার কটু কথা বা ঘেন্নাই যদি তিনি করেন, সে আমার

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হবে সঞ্জীববাবু—। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার পরিচয় তো আপনার কাছে গোপন নেই—আমাদের জাতের গর্ভধারিণীদের মুখের পরিচয় আপনি জানেন না তাই এমন কথা বললেন। এক পাশে বারান্দায় শুয়ে থাকব রাত্রিটার মত।

সঞ্জীব কহিল—কিন্তু সে যে আমার চোখে বড় খারাপ ঠেকবে। আপনারা আমার অতিথি—

হাসিয়া নলিনী কহিল—হাজতের চেয়ে যে সে অনেক ভাল সঞ্জীববাবু। তা ছাড়া প্রচলিত যুগপ্রথায় অতিথিরও সে ক্লাসিফিকেশন সমাজে চল হয়ে গেছে। এই তো আপনাদের এখানে বাবুদের বাড়িতে সেদিন দেখলাম মুসলমান রাজকর্মচারীর এঁটো কাপ ধরে নিতে দশ-বারোখানা হাত একসঙ্গে এগিয়ে এল। আর তারই সঙ্গে ছিল একটি ব্রাহ্মণ কনেস্টবল—সে বেচারা চা পেলেই না সেদিন,—সে জলে ভিজেও ছিল, সেই ভিজে অবস্থায় সত্যিই হয়তো তারও এক কাপ চায়ের দরকার ছিল।

সঞ্জীব বলিল—এটাতে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু যতখানি ওজনের দোষ আপনি চাপাচ্ছেন ততখানিও সত্যি নয় বলে আমার মনে হয়। জাতিভেদ আমি মানি নে। যে মানে তার কাছেও অথিতির জাতিভেদ থাকা উচিত নয়। সুতরাং স্বজাতি ভিন্ন জাতির কথাটা ধরা যায় না। তারপরে যে ভেদ সেটা হয়েছে গুণ-কৌলীন্যে—ধন-কৌলীন্যের অপরাধ ওখানে স্পর্শ করে নি। ওইটেই আমার মনে হয় সব চেয়ে হীন কৌলীন্য—ওটা একটা অপরাধ।

সঞ্জীবের এ কথাটা নলিনীর বেশ পছন্দ হইল না, কিন্তু যে লোকটি তাহাকে এ হেন বিপদে মাত্র একটি অনুরোধে জীবনের অমার্জনীয় অপরাধ উপেক্ষা করিয়া উদ্ধার করিল—আবার আশ্রয় দিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত এ লইয়া তর্ক করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ভাবিল মতের মর্যাদার চেয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ তাহার বহুগুণে বেশী হওয়া উচিত। আজ যদি সে মতের মর্যাদা করিতে চায় তবে সে নিজের অমর্যাদাই করিবে বেশী।

অবসর পাইয়া রমা মৃদুস্বরে বলিল—দিদিমণি, আমাদের বাড়ি চল না?

নলিনী স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তুমি কি অদ্ভুত ছেলেমানুষ রমা! এই রাত্রের অন্ধকারে—এই দেশের পথ দিয়ে তোমাদের বাড়ি যেতে তোমার সাহস হয়?

লজ্জিত হইয়া রমা কহিল—না—না। তবে বাবুর মা বকবে বলছিলে যে তাই—

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে এ কথার জবাব দিল—না না না। সে ভয় নেই। মা কটু কথা কখনও বলবেন না। তবে তিনি স্পষ্টভাষিণী। স্পষ্ট সত্য অনেক সময় রূঢ় হয়। আর ছোঁওয়া-নাড়ার বাছবিচার তিনি করে থাকেন, এই পর্যন্ত।

নলিনী হাসিয়া কহিল—কাকে কি বলছেন সঞ্জীববাবু? কটু কাকে বলে সে ও বোঝে না। সত্যই বা কি বস্তু সেও ও জানে না। ওর কথা আপনি ধরবেন না। ভাল করে না দেখলে ও যে কি সে বিচার করা যায় না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—উনি কে?

—ও উনি নয়। জগতে ও সকলের স্নেহাস্পদা হবার যোগ্যা। ওর পরিচয় এর পরে বলব। ওর দৃষ্টিতে এ সংসারে খারাপ ও কাউকে দেখে নি। ওদের গ্রামের মহাজন এককড়ি গাঙ্গুলীও ওর কাছে দেবতুল্য ব্যক্তি।

সদর রাস্তা হইতে একটা গলির পথে মোড় ফিরিয়া সঞ্জীব কহিল—তাই তো—একটা আলো হলে ভাল হত। অচেনা গলি, পথে চলতে—

অকস্মাৎ পাশের কোন অন্ধকার গোপন স্থান হইতে একটি লোক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সঞ্জীব চমকিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

চাপা গলায় উত্তর হইল—আমি—আমি গাঙ্গুলী-খুড়ো, এককড়ি গাঙ্গুলী। তারপরে ভাল আছ তো বাবা সঞ্জীব?

সঞ্জীব বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—আপনি এখানে এমনভাবে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছিলেন? এমনধারা চাপা গলায়—

—দেওয়ালের কান আছে রে বাবা, দেওয়ালেরও কান আছে। ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে—বুঝলে বাবা! এ গাঁয়ে তুমি যে কথাটি চেঁচিয়ে বলেছ—তিন কান করেছ, সেইটাই গিয়ে কাছারীতে রিপোর্ট হয়েছে।

সঞ্জীব এখানকারই মানুষ—এখানকার মানুষের পরিচয় তার অজ্ঞাত নয় এবং এখানকার প্রচলিত ভাষার প্রবচনগুলোর অর্থও সে জানে। কাছারীর উল্লেখ করিতেই সে বুঝিল এ জাল রচনায় গাঙ্গুলীর মত কৃতী কৌশলী ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন হস্তও আছে। সে কহিল—এ ব্যাপারের তাহলে আপনি সব জানেন?

স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতকণ্ঠে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড, পাষণ্ড, মহাপাষণ্ড, বুঝলে বাবাজী, চণ্ডাল নরাধম বেটা। ধন থাকলেই কিছু মানুষ হয় না, ধার্মিক হয় না, মহাপুরুষ হয় না। জিজ্ঞাসা কর এই এঁকে—আমাদের লেডি ডাক্তারকে, ভাল মানুষের মেয়ে উনি—নিজে অতি ভাল লোক। মুখের সামনে বললে মনে হবে তোষামোদ করছি, কিন্তু সত্যি বলছি আমি, অতি মহৎ লোক উনি। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর তুমি, কি মহাপাষণ্ড চণ্ডাল—ইতর—

অনর্গল অর্থহীন প্রলাপের কোন জবাব হয় না। সঞ্জীব বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিল—কি সব বাজে বকছেন আপনি? চুপ করুন।

ইহাতেও গাঙ্গুলী নিরস্ত হইল না। সে এদিক ওদিক চাহিয়া লইয়া সঞ্জীবের কানের কাছে সহসা মুখটা লইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল—ওই শালা মহেন্দ্রবাবু!

সঞ্জীব উষ্ণভাবে কহিল—বুঝলাম, কিন্তু তার প্রতিবিধান আমি কি করতে পারি? তাছাড়া ওরকমধারা গালাগাল দেওয়া পছন্দ করি না গাঙ্গুলী মশায়।

গাঙ্গুলী উচ্ছ্বাসভরে কহিল—সেই কথাই তো বলি—যে ধার্মিক হবে, যার মনুষ্যত্ব থাকবে, সৎশিক্ষা যার আছে, সে তো এই কথাই বলবে। এই তো তাদের কাজ। এই এত বড় গ্রামে সহায়হীনা দুটি স্ত্রীলোক বিপদাপন্ন হল, তা কোন বেটার সাধ্যি হল না আঙুলটি

ভুগতে—। স্বত সব গরু ভেড়ার জাত, বিষকুম্ভপয়োমুখম—

নলিনীরও বিরক্তি বোধ হইতেছিল—সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—সে ধরনের মানুষ আমরা দেখেছি গাঙ্গুলী মশায়। এ নিয়ে মিছে আর চিৎকার করবেন না আপনি।

চট করিয়া গাঙ্গুলী জবাব দিল—সে তো হাজারে হাজারে সংসারে রয়েছে—দেখবেন বৈ কি। এই আমাকেই দেখুন না। আমিও তো তাই। নইলে ওই চণ্ডাল ইতরের তাঁবেদারী করি আমি স্বার্থের জন্য—।

নলিনী অপ্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে উলঙ্গভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া দেওয়ায় সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। তাহার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গেল যে হয়তো বা লোকটাকে যাহা সে ভাবিয়া আসিয়াছে ততখানি হীন সত্যই সে নয়। স্বার্থের দাস তো সংসারে হাজারে ন'শো নিরানব্বই জন। কিন্তু স্বার্থে অন্ধ সে-ই নয় যে স্বার্থপরতা হেতু গ্লানি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। মানুষ তাহার অন্তরে আজও বাঁচিয়া আছে।

সঞ্জীব কহিল—আমার কাছে কি আপনার কোন দরকার আছে? অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠস্বর এবং ভঙ্গিটি পর্যন্ত উগ্র।

গাঙ্গুলী কিন্তু বিরক্ত হইল না। সে মোলায়েম করিয়া বলিল—আছে বৈকি বাবা। সৎকর্ম করলে আশীর্বাদ করতে হয়। সেটা যে অবশ্য কর্তব্য। সেই আশীর্বাদ করব বলেই—নইলে আমার গাড়ি সন্ধ্যে থেকে এসে বসে আছে। আর এই রমাকে নিয়ে যাব। ওর বাপ-মা কেঁদে কেঁদে নদী গঙ্গা ভাসালে। মহাপাতক থেকে মুক্ত হব বাবা আমি। তোমারই দৌলতে—সৎসাহসে, নইলে মহাপাপে ডুবতে হত আমাকে।

নলিনী ইহার উত্তর দিল—কাল ওকে নিয়ে যাবেন গাঙ্গুলী মশায়। এই রাত্রে—

বাধা দিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কোন ভয় নেই আপনার—কোন ভয় নেই। এমন পথ দিয়ে নিয়ে যাব যে কীটপতঙ্গে টের পাবে না।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সে হবে না গাঙ্গুলী মশায়। ও যখন আমার আশ্রয়ে এসেছে তখন তো এমন ভাবে আপনার হাতে দিতে পারব না আমি। কাল ও বাপকে সঙ্গে করে এখানে আসবেন, আমি বিবেচনা করে তখন যা হয় করব।

চমকিয়া উঠিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—তার মানে?

পরিষ্কার কণ্ঠে সঞ্জীব উত্তর দিল—তার মানে আপনাকে বিশ্বাস করে ওকে আপনার হাতে আমি দিতে পারব না।

—আমি যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে দিব্যি করছি—

—যজ্ঞোপবীতে আমার বিশ্বাস নেই গাঙ্গুলী মশায়—আমার নিজেরও পৈতে নেই।—

কয়েক মুহূর্ত হতবাক হইয়া থাকিয়া গাঙ্গুলী বলিল—আচ্ছা বাপু, সে তুমি নাই বিশ্বাস কর, কিন্তু রমা যখন যেতে চাচ্ছে তখন তুমি আটক করবার কে শুনি?

সঞ্জীব কোন কিছু বলিবার পূর্বেই নলিনী রমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, রমা?

যেন তাহার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হইতেছিল।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—আমি বাড়ি যাব দিদিমণি।

গদগদ হইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—ওই-ওই শুনলে তো বাবা সঞ্জীব। রমা বলছে ও বাড়ি যাবে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু উনি যে আমাদের জন্যে জামিন হয়ে এলেন, সে জামিনের—

মধ্যপথেই সঞ্জীব কহিল—না, সে শুধু আপনার জন্যে। ও মেয়েটির বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল না—জামিনও আমায় হতে হয় নি।

তারপরে রমাকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল—যাও তুমি তাহলে ওঁর সঙ্গে। বলিয়া সম্মুখের গৃহদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—মা মা মা!

পিছন হইতে গাঙ্গুলী আবার ডাকিয়া বলিল—ওগো বাবাজী, আর একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে। আমার সেই বন্ধকী তমসুকখানা—অনেকদিন হয়ে গেল—তোমার বাবার আমলের ব্যাপার।

সঞ্জীব যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—কি—কি বলছেন আপনি? সে তো—

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া হ্যারিকেন হাতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বাহির হইয়া কহিলেন—সঞ্জীব? কখন এলি বাবা? আর কার গলা শুনছিলাম! এ মেয়েটি কে রে?

সঞ্জীব কহিল—দাঁড়াও সে-সবই শুনবে। গাঙ্গুলী মশায়—কই গাঙ্গুলী মশায়?

গাঙ্গুলীকে দেখা গেল না, রমাও নেই—নিরন্ধ্র অন্ধকার পিছনে থমথম করিতেছিল।

নলিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, কহিল—কাল স্নানে যখন যাবেন তখন আপনার পায়ের ধুলো নেব। আজ ভাগ্যে আমার নেই মা।

মা মেয়েটির মুখের ওপরে আলো ধরিয়া আর একবার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া কহিলেন—ইনি এখানকার মেয়ে-ডাক্তার, নয় রে সঞ্জীব?

সঞ্জীব তখনও বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে গাঙ্গুলীর সন্ধান করিতেছিল, সে সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল—হ্যাঁ মা।

মায়ের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—ইনি এখানে কেন?

কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় চমকিয়া উঠিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইল। সে কোন উত্তর দিবার পূর্বে নলিনীই উত্তর দিয়া বসিল—আপনার বাড়ি অধিকাংশ লোকেই যে-জন্য আসে, মা আমিও সেই জন্য এসেছি। আমি বড় বিপদে পড়েছি, মা। এখানকার মহেন্দ্রবাবু আমায় জেলে দিচ্ছিলেন আমি চুরি করেছি বলে। পথে স্টেশনে সঞ্জীববাবুর দেখা পেয়ে ওঁর আশ্রয় চেয়েছিলাম। ইনি জামিন হয়ে আমায় উপস্থিত মুক্ত করে এনেছেন।

মায়ের মুখ আরও থমথমে হইয়া উঠিল। তিনি সঞ্জীবকে কহিলেন—এর পরিচয় তুমি জান সঞ্জীব?

কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ক্রোধ যেন রন্ রন্ করিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—জানি মা, স্টেশনে মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী সতীশ মিত্তিরের কাছে সমস্ত পরিচয় পেয়েছি। সে যত গ্লানিকর ইতিহাস ছিল সব আমায় জোর করে শুনিয়ে তবে ছেড়েছে। ইনিও অকপটে সত্য যেটুকু স্বীকার করেছেন। কিন্তু মা ইনি যাই হোন, ইনি স্ত্রীলোক, আর বেশ বুঝলাম আমি, মিথ্যা ষড়যন্ত্রে এঁকে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে শুধু মাত্র বিপদাপন্ন করে এঁকে আয়ত্ত করবার জন্য। সেক্ষেত্রে—

উষ্ণভাবে কথার অবশেষটুকু যেন মা শেষ করিয়া দিলেন, কহিলেন—তাই তোমার অমনি দয়া হয়ে গেল—কেমন?

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল, এ-কথার কোন জবাব দিল না। উত্তর দিয়া মাকে সে আর অধিক উত্তপ্ত করিল না। নলিনীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। এতখানি কল্পনা করে নাই সে। তাহার মনে হইতেছিল এর চেয়ে থানা-হাজত বহুগুণে ছিল ভাল। সেখানে যতই না দুঃখ থাকুক—অনধিকারের হীনতা সেখানে তাহার ছিল না। আর চোরের অপমান তো তাহার হইয়াই গিয়াছে। লাঞ্ছনা সেখানে যতই থাকুক—গঞ্জনা সেখানে ছিল না।

মা কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন—এস বাড়ির ভেতরে এস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে আর হবে কি? এস গো তুমিও এস, তোমার আর দোষ কি বল? আমার দয়ার সাগর ছেলে তোমায় না আনলে তো আর তুমি আসতে না বাছা। এ যদি আগে জানতাম আমি তবে যে গর্তে আগুন ধরিয়ে দিতাম! নাও মহাপুরুষ, মুখ-হাত ধুয়ে ফেল—কাপড় ছাড়, না এই আশ্বিনের রাত্রেই স্নান হবে?

সঞ্জীব কহিল—স্নানই করব। সে ব্যাগ খুলিয়া কাপড় গামছা বাহির করিতে বসিল।

মা নলিনীকে কহিলেন—তুমি মুখ-হাত ধোও বাছা। এস আমার সঙ্গে, এস জায়গা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

নিজেই তিনি এক বালতি জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। দুইটি ঘরের মধ্যস্থলে তিনদিক অবারিত বেশ একটি নিরিবিলি স্থান। তলদেশটি বাঁধানো থাকায় কোন অসুবিধা নাই। এক দিকের দেওয়ালের হুকে একটি কেরোসিনের ডিবে ঝুলাইয়া দিয়া কহিলেন—কাপড় ছাড়বে তো বাছা?

ঘাড় নাড়িয়া নলিনী ইঙ্গিতে জানাইল—না।

রূঢ়স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন—খ্রীষ্টান হও আর যাই হও বাছা—ময়লা কাপড় ছাড়াটা উচিত। এ কি আচারভ্রষ্ট তোমরা! এগুলোতে ধর্ম হোক আর না হোক, শরীর তো ভাল থাকে। ও, তোমার কাপড়-চোপড় কিছু নাই বুঝি? দাঁড়াও, সঞ্জীবের কাপড় একখানা এনে দিই তোমায়।

অল্পক্ষণ পরেই একখানা কাপড় আনিয়া হুকে ঝোলাইয়া দিলেন। একটি সাবান নামাইয়া দিয়া কহিলেন—এই নাও সাবান রইল। আর জল যদি দরকার হয় তবে আমায় ডেকো, বুঝলে?

মুখ-হাত ধুইতে ধুইতে নলিনী ভাবিতেছিল, এইবার মা বোধ হয় পুত্রের উপর আর এক দফা ঝাল ঝাড়িবেন।

এবার আর তাহার উপস্থিতি হেতু ওই দুর্দান্ত মুখরারও যেটুকু চক্ষুলজ্জা আছে—সেটুকুও থাকিবে না। সে শিহরিয়া উঠিল।

মায়ের গলাও শোনা গেল।

মা বলিতেছিলেন—কি খাওয়া হবে মহাপুরুষ? দুটো ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই, কি বলিস?

ছেলে কহিল—তাই দাও।

—তবে তুই পুকুরে স্নান করতে যাবি আর শম্ভু বাগ্দীকে বলবি দুটো আড়ার মাছ দিয়ে যাবে সে।

—সে বলব। কিন্তু তুমি বস তো একটু, একটা কথা শোন দেখি।

—কাল সকালে শুনব কথা। যা তুই এখন স্নান করে আয়—আমার অনেক কাজ। উনোনে আঁচটা দিয়ে দিই।

নলিনী এই সময় মুখ-হাত ধুইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাতা-পুত্রের কথার সুরে সে ভরসা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল—আঁচটা আমি দিয়ে দেব মা?

মা ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—না বাছা, তুমি আমার ঘরে আগন্তুক অতিথি মানুষ। তোমাকে ও কাজ করতে দেওয়া আমার পাপ হবে। তুমি বরং বস ওখানে, সঞ্জীব, তোর সতরঞ্চিটা দে তো বের করে পেতে।

সঞ্জীব ঘর খুলিয়া একখানা সতরঞ্চি বাহির করিয়া বিছাইয়া দিল, কহিল—মা ঠিকই বলেছেন, আপনি অতিথি, আমরা আপনার পরিচর্যা করব। আপনি বিশ্রাম করুন একটু। আপনার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে আজ।

উনোনের মুখে বসিয়া আঁচ দিতে দিতে মা বলিলেন—আহা কচি মেয়ে, তার উপর অত্যাচার দেখ তো!

সে কণ্ঠস্বর ওই মুখরার কণ্ঠে বিস্ময়ের বস্তু। সে স্বরকারুণ্য নলিনীকে স্পর্শ করিল। সে সতরঞ্চির উপর বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমস্ত দিনের যুদ্ধক্লান্ত মনের অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহখানিকে যেন নাগপাশের মত বেড়িয়া ধরিল। এমনি একটি মুহূর্তের শুধু যেন অপেক্ষা ছিল, সেই মুহূর্তটি পাইবামাত্র দেহটা যেন এক নিমেষে ভাঙিয়া গেল, ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিয়া সে সতরঞ্চির উপর শুইয়া পড়িল। ঊর্ধ্ব দৃষ্টির সম্মুখে শরতের নিবিড় নীল আকাশভরা ঔজ্জ্বল্য তাহার ভাল লাগিল। ভাল

লাগিবারই কথা—মনে মনে তখন তাহার ক্লান্ত আনন্দ, তাহার বিপদ আজ সুসহায়ের আশ্বাসের মধ্যে নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে। তারার মালার মধ্য দিয়া শুভ্র ছায়াপথখানি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এখনও বর্ষার বাতাস বন্ধ হয় নাই। পূবে সজল হাওয়া ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল। নলিনীর চোখ দুটি আসন্ন ঘুমে নিমীলিত হইয়া আসিতেছিল।

স্বপ্নহীন নিশ্চিন্ত নিদ্রা হইতে সে জাগিয়া উঠিল সঞ্জীবের মায়ের ডাকে। ডাকিয়া তুলিয়া তিনি কহিলেন—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছ মা, ডেকে তুলতে আমারই কষ্ট হচ্ছিল। ওঠ মা, মুখে দুটো দিয়ে নাও।

নলিনী লজ্জিত হইয়া কহিল—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মা কহিলেন—ঘুমের আর দোষ কি মা? মুখে একটু জল দাও, ওই ঘটিটাতেই জল আছে।

মুখে হাতে জল দিয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—সঞ্জীববাবু খেয়েছেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর উগ্র হইয়া উঠিল—বলো না বাছা সে আপদের কথা—আমার জীবনের অশান্তি সে। এই রাত্রে বেরিয়েছেন মহাপুরুষ, তার এক নাইট স্কুল আছে, তাই দেখতে। তুমি খেয়ে নাও বাছা—তার অপেক্ষায় তুমি আর কতক্ষণ বসে থাকবে। রাত এগারটার গাড়ি চলে গেল। সে যখন আসবে তখন খাবে। এই রাত্রে খবর না নিলে তার আর ঘুম হচ্ছিল না। কখনও কোন দিন যদি শান্তি সে দিলে আমায়।

সঞ্জীবের জন্য অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস নলিনীর হইল না। মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহার ভয় হইল—কি জানি এই দুর্মুখী কি বলিয়া বসিবে! আহার তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় সঞ্জীব আসিয়া উপস্থিত হইল। মা কহিলেন—পায়ে জল দে ফের। যত সব ছোটলোক পাড়া মাড়িয়ে এলি তুই।

সঞ্জীব স্যাণ্ডেলটা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—ছোটলোক কথাটা তোমার ব্যবহার করা উচিত নয় মা। এবার আমি ওদের বলে দেব—না খেয়ে ওরা শুকিয়ে মরবে তবু তোমার সাহায্য নেবে না আর।

মা গর্জন করিয়া উঠিলেন—এত রাত্রে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলি নাকি তুই? যা বলছি তাই কর। মুখ ফসকে ভুল হয়ে যাওয়াটা দোষের নয়।

হাসিতে হাসিতে সঞ্জীব পা ধুইয়া কহিল—গিয়েছিলাম একবার হারাণদার বাড়ি। ও বুড়ো তো সব জানে। ও-ও বললে, বাবা কড়ি গাঙ্গুলীর টাকা সব শোধ করে দিয়েছেন। পঁচিশ টাকা কম ছিল। তা সে টাকা ভদ্রলোকের মীমাংসায় বাবা রফা পেয়েছিলেন। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা আর ফেরত দেয় নি। হারাণদাও কতবার ওই দলিলের জন্য গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে। তোমায় শুনতে বললাম তখন—শুনলে না তুমি।

আমি এই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—কেন? এ কথা হঠাৎ ওঠবার কারণ কি হল? কড়ি কি ফের সেই টাকা দাবী করছে নাকি? তার গলাও যেন শুনছিলাম তখন?

আসনে বসিয়া সঞ্জীব কহিল—হ্যাঁ মা। সেই কথাই বলছিল আজ। আমার পেছনে পেছনেই আসছিল। তুমি দরজা খুললে সে-সময়—সেই সময় পালাল।

ভাতের থালাটা কোলের কাছে আগাইয়া দিয়া মা কহিলেন—আরও কত হবে এর পরে। এই তো প্রথম।

সঞ্জীব একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—কি বলছ, কিছু যে বুঝতে পারলাম না, মা!

ঈষৎ হাসিয়া মা জবাব দিলেন—ভীমরুলের চাকে আজ খোঁচা দিয়েছ—তার পাল্টা আক্রমণের সময়ে বুঝতে পারলাম না বললে চলবে কেন?

সঞ্জীব আরও বিস্মিত হইয়া কহিল—বল কি মা? এ কি মহেন্দ্রবাবুর কাজ?

—হ্যাঁ, বাবা। এতে কোন ভুল নেই। কড়ি গাঙ্গুলী মহেন্দ্রবাবুর পোষা কুকুর, সে যা করে মনিবের মনস্তুষ্টির জন্যই করে থাকে। তবে তার নিজের পেট ভরাটা হল প্রথম লক্ষ্য।

সঞ্জীব খাইতে খাইতে ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ সে বলিয়া উঠিল—এতদূর হীন মানুষ হতে পারে? আমি তো তার কোন অনিষ্ট করি নি?

মা বলিলেন—ওরে গ্রহদেবতায় মানুষের যখন অনিষ্ট করে তখন বিপন্নের উপকার করলে তারা উপকারীর উপর সন্তুষ্টই হয়। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অপকার করে তখন বিপন্নের উপকার করতে গেলে মানুষ হয় রুষ্ট—মানুষের রাগের ভাগ নিতে হয়।

সঞ্জীব নীরবে আহার করিয়া গেল। মা আবার তাহাকে কহিলেন—ভয় কি বাবা! ভগবান আছেন, তিনি কখনও সৎকাজে কারও অমঙ্গল করেন না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—ভগবান তো জানি নে মা, আমি তোমাকেই আমার ভগবান বলে মানি। ভয় আমি করব না।

মা জ্বলিয়া উঠিলেন—এইটেই তোমার সব চেয়ে বড় অপরাধ সঞ্জীব। ভগবান মানি না কি? এ যদি কর সঞ্জীব তবে তোমার সঙ্গে আমার বাস করা চলবে না।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—মানি নে তো বলি নি আমি, বললাম জানি না।

মা বলিলেন—ওরে তাঁকে আগে মানতে হয় তবেই তাঁকে জানতে পারা যায়।

নলিনীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। এত গভীর নিষ্ঠার সহিত ভগবানকে নির্দেশ তাহার কাছে কেহ কখনও করে নাই। সে যেন দেবস্থলের সান্নিধ্য অনুভব করিল। আকাশ ভরা তারার দিকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

সকালে যখন নলিনী উঠিল তখনও রৌদ্র ভাল করিয়া উঠে নাই। গ্রামপ্রান্তের বৃক্ষসন্নিবেশের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্য তখন চোখের সম্মুখে আকাশের কোলে দেখা দেয় নাই। কিন্তু

বাহিরে আসিয়া সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সঞ্জীবের মায়ের তখন স্নান হইয়া গিয়াছে। তুলসীমঞ্চের নীচে বসিয়া তিনি দেবার্চনা করিতেছিলেন। ওদিকে রান্নাঘরের বারান্দায় উনোনে কয়লা গম্ গম্ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে। কেট্‌লীতে চায়ের জল গরম হইতেছিল।

সঞ্জীবের মা পূজায় বিরতি দিয়া বলিলেন—মুখ হাত ধুয়ে ফেল বাছা। মাঠে যেতে সঞ্জীব চায়ের জল চাপিয়ে দুধ আনতে গেছে।

নলিনী তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইবার স্থানে গিয়া দেখিল—মাজন, বাঁশের একটি জিভছোলা, সাবান সমস্ত দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালের গায়ে হুকে একখানি ধোওয়া ফিতেপাড় কাপড় ঝুলিতেছিল। ওপাশ হইতে মা আবার ডাকিয়া কহিলেন—মোটা কাপড়ই দিতে হল বাছা, সঞ্জীবের তো খদ্দরের কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় নেই। কি করব?

এই পরিচর্যায় নলিনীর লজ্জার আর সীমা রহিল না। তাহার অপরাধ যেন পাহাড়প্রমাণ হইয়া উঠিল। সে একটুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর শুধুমাত্র কাপড়খানি ঘাড়ে ফেলিয়া খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে ফিরিল একেবারে স্নান সারিয়া।

সঞ্জীব উনোনের কাছে বসিয়া চায়ের জল ফোটা দেখিতেছিল। সে সদ্যস্নাতা নলিনীকে দেখিয়া কহিল—এ কি, আপনি কি ওই ডোবাটায় স্নান করে এলেন নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া নলিনী তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল, তখনও তাহার ভাল করিয়া মাথা মোছা হয় নাই।

মা পূজা সারিয়া উঠিতেছিলেন, তিনি কথাটা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি বাছা, কি ধারার মানুষ গো তুমি? আমি জল রাখলাম, সব উয্যুগ করে রাখলাম—সে তোমার পছন্দ হল না বুঝি? শেষে জ্বর হলে তোমার সেবা করবে কে বল তো? নিজেরও তো একটা বিবেচনা বলে জিনিস আছে?

নলিনী হাসিমুখেই ঘরের ভিতর হইতে উত্তর করিল—আপনার তোলা জলে কি আমি স্নান করতে পারি, মা? সে পাপ যে কখনও খণ্ডন হত না আমার।

সঞ্জীবের মা অতি রূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু এঁদো ডোবায় ডুব দিয়ে জ্বর হলে যে তখন আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। তখন যে আমার জাত বাঁচানো দায় হবে।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—উনি ডাক্তার মানুষ মা, রোগ ওঁদের ভয় করে।

মা বলিয়া উঠিলেন—তা করবে বৈকি। সে ভয় করে না কারুর—তোদের গাঁয়ের প্রবল-প্রতাপ মহেন্দ্রবাবুকেও না। দে বাপু দে, একটা কুইনিনের পিল ওকে দে। চায়ের সঙ্গে খেয়ে নাও বাছা। আমাকে আর বিপদে ফেলো না।

নলিনী বাহিরে আসিয়া কি একটা বলিতে গেল। কিন্তু তাহার মুখপানে চাহিয়াই সঞ্জীবের মা বলিয়া উঠিলেন—রাম রাম—ও কি বিচ্ছিরি করে চুল ফিরিয়েছ তুমি গো? মাঠের মতন কপাল বের করে—ও কি ভঙ্গী হয়েছে তোমার? যাও যাও, সঞ্জীবের ঘরে আয়না চিরুনি আছে, চুলটা ভাল করে ফিরিয়ে এস—কেমন করে হালফ্যাসানে চুল বাঁধ গো তোমরা! একে তো ওই ছিরি তোমার রূপের—তার ওপর ও কি ভঙ্গী করে রেখেছ?

কালো-কুচ্ছিত মানুষ আমি দেখতে পারি না বাপু।

সঞ্জীব ঈষৎ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইঙ্গিতে অনুনয় করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—ও ঘরে সামনেই টেবিলের ওপর আয়না চিরুনি পাবেন। কিছু মনে করবেন না, মায়ের আমার—

নলিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন বলুন তো?

সঞ্জীব খুশী হইয়া উঠিল, সে বলিল—যান তাহলে, শীগগির আসবেন—চা তৈরি করছি আমি।

যাইতে যাইতে নলিনী কহিল—চা খাব না আমি।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন?

নলিনী তাহার আরক্ত চোখ দুটি ফিরাইয়া লইয়া কহিল—আপনারা আমায় মনে করেছেন কি বলুন তো? মেয়েমানুষ হয়ে আমি এত বড় লজ্জাহীনা যে আপনার তৈরি চা আমি খাব!

নলিনীর চোখে জল আসিয়াছিল। সে দ্রুতপদে ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সঞ্জীব মৃদুস্বরে মাকে কহিল—ছি মা, লোকে কুৎসিত হলে কি—

মা দেবার্চনা শেষ করিয়া পূজার স্থান মার্জনা করিতেছিলেন—তিনি সবিস্ময়ে ঝংকার দিয়া উঠিলেন—তা বলে কালোকে কালো বলব না? ওর চোখ আর চুল ছাড়া কোনখানটা মুখের ভাল বল দেখি?

সঞ্জীব মৃদুস্বরে কহিল—তা হয়তো নয়—কিন্তু মনে তো কষ্ট হতে পারে।

মা কহিলেন—ওরে না—মেয়েমানুষ এত বোকা নয়। তারা স্নেহ ঘেন্না বেশ ভাল বুঝতে পারে। ভাল যদি না বাসব তবে মুখখানি ওর যাতে সুন্দর লাগে তা করতে আমি বলব কেন?

চুল ফিরাইয়া নলিনী হাসিমুখে আসিয়া বসিল, কহিল—সরে বসুন আপনি, চা আমি তৈরি করব।

সঞ্জীব ইতস্ততঃ করিতেছিল। মা বলিয়া উঠিলেন—দে না বাপু এগিয়ে—মেয়েমানুষেরই তো কাজ ওসব। আমি তো ওসব তোদের ছুঁইও না।

নলিনী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কাপ-কেটলী আগাইয়া লইয়া চা তৈয়ারি করিতে বসিল।

মা কহিলেন—দেখ তো বাছা কেমন টুকটুকে লাগছে মুখখানি। কেশ দিয়েছেন ভগবান বেশ করবার জন্য। বেশ না করলে মানাবে কেন? তা না উটকো-মুখী চওড়া কপাল বের করে—ছি!

এক কাপ চা সঞ্জীবকে আগাইয়া দিয়া নিজে একটা টানিয়া লইল। তারপর সঞ্জীবকে কহিল—কুইনিন ট্যাবলেট?

মা তরকারির বঁটি পাড়িতেছিলেন—কথাটা তাঁহার কানে গিয়াছিল। ঘর হইতে কাগজ-

মোড়া কুইনিনের পিল আনিয়া আলগোছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—তুইও একটা খা সঞ্জীব। আর ওগো বাছা—এগুলি বাপু তোমাকে ধুয়ে নিয়ে আসতে হবে, বুঝেছ?

নলিনীর মনের গ্লানি সব ঘুচিয়া গেল। সে আনন্দে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—বেশ।

সঞ্জীব সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল—আপনি কি আজই কলকাতা যাবেন?

নলিনী যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—সে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল—হ্যাঁ, তাই যাব। আজই বৈকি।

উৎসাহহীন অন্যমনস্ক চিত্তে নলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কি উদ্দেশ্যে যে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভ্রূ-ললাট কুঞ্চিত করিয়া সে চিন্তা করিল। অবশেষে অকস্মাৎ মনে হইল জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইতে হইবে, আজই তাহার কলিকাতা যাত্রার দিন।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মনে হইতে তাহার হাসি আসিল। গুছাইয়া লইবার মধ্যে আছে তাহার একখানি তোয়ালে। আর সবই সে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। যে কাপড়খানা সে পরিয়া আছে সেখানি পর্যন্ত অপরের। মনটা তাহার বিষাইয়া উঠিল—এমন করিয়া পরমুখাপেক্ষী অনুগ্রহ-ভিখারী হইয়া থাকার লজ্জাকর বেদনা মনের মধ্যে সূচের মত বিঁধিতেছিল। কলিকাতা যাইবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ও-ঘরে দাওয়ার উপর বসিয়া মা ও ছেলেতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। মা কি বলিতেছেন আর সঞ্জীব একখানা কাগজে সেইগুলিই বোধ হয় লিখিতেছে। নলিনী বেশ সাড়া দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

মা মুখ তুলিয়া কহিলেন—বসো। সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। নলিনী একপাশে বসিল। মা ছেলেকে কহিলেন—হল, মুড়ি-ভাজুনীর কাপড় লিখলি?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। কিন্তু আর তোমার কত আছে? এই তো দশ জোড়া হয়ে গেল।

মা বলিলেন—আরও আছে। যারা চিরকাল পেয়ে আসছে তারা এ পূজোর সময় কাপড় না পেলে ছাড়বে কেন? জানিস কীর্তি না করতে পারি বৃত্তি কখনও লোপ করতে নেই।

হাসিয়া সঞ্জীব কহিল—মা, এই বৃত্তিতেই আমাদের সর্বনাশ হল। দান নিয়ে নিয়ে জাতটার ভিক্ষে করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—দান কাকে বলছিস তুই? দান করে লোকে দয়া করে। আর বৃত্তি হল সম্মান। এ যে তারা নেয় এই আমাদের ভাগ্যি। আর শাকওয়ালী, মাছওয়ালী এদের তো ফল পাওনা। সম্বচ্ছর তারা আমাদের উপকার করে, খাটে, তার

জন্য এ তো তাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

সঞ্জীব আবার হাসিল, কহিল—বেশ, বল আর ক-জোড়া চাই?

—কার কার হল বল্ দেখি?

ফর্দটায় চোখ বুলাইয়া সঞ্জীব পড়িয়া গেল, পুজোর শাড়ি লালপেড়ে একজোড়া, কুমারী পুজোর শাড়ি একজোড়া। গুরুপ্রণামী থান একজোড়া, পুরোহিতের ধুতি একখানা। ব্রাহ্মণডিহির রাম চাটুজ্যের বৃত্তি ধুতি একখানা। কানাই গাঙ্গুলীর বৃত্তি ধুতি—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—ধুতি নয় থান লেখ্। কানাই গাঙ্গুলী মরে গেছে, বিধবা মেয়ে পরবে, থানই ভাল। তারপর?

—মাহিন্দার রাখালের মোটা ধুতি একজোড়া, গেঞ্জি একটা—

—ওদের কাপড় চওড়াপাড় নিয়ে আসবি। অভাবী মানুষ, সময় অসময় ওর বউও যেন পরতে পায়।

সঞ্জীব সংশোধন করিয়া লইয়া কহিল—ঠিক বলেছ মা। তাহলে কৃষেণদেরও ঐ রকম হবে তো?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। তারপর পড়ে যা।

—মেছুনীর শাড়ি একখানা। রোজদার মুদীর একখানা, গয়লানীর শাড়ি একখানা, ঘাসওয়ালীর শাড়ি একখানা। তারপর তোমার মুড়ি-ভাজুনীর কাপড়—কি রকম হবে বলে দাও।

—ওখানা ধুতিপাড় নিয়ে আসবি। বিধবা মানুষ, শাড়ি তো হবে না।

—বেশ, তারপর?

—ধোপানীর শাড়ি লেখ্। আর ভাল ধোওয়া শান্তিপুর কি ফরাসডাঙ্গার শাড়ি একখানা। কিম্বা আজকাল খদ্দরের ঢাকাই শাড়ি বেশ ভাল দেখে তাই নিয়ে আসবি।

সঞ্জীব কহিল—কার জন্যে, ফর্দে নাম লিখব কার?

মা বলিলেন—কোন নাম লিখতে হবে না, এমনি লেখ্ না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইলি যে? তোর বড় বদ অভ্যেস হয়ে পড়ল সঞ্জীব। কথায় কথায় তোকে আমায় কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি? লেখ্, আটপৌরে তোর আবার খদ্দর চাই বুঝি, খদ্দর দু'জোড়া আর পোশাকী একজোড়া, ভাল জামা একটা।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাকে কি এখনও ছেলেমানুষ পেলে মা যে পুজোতে আমার পোশাক চাই!

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন—হ্যাঁ চাই। আমি বলছি তুই লেখ্। আমি মরি তারপর তোর যা ইচ্ছে হয় করিস। হ্যাঁ, আর মেয়েদের ভাল জামা যা পাওয়া যায় নিয়ে আসবি, তার সঙ্গে সেমিজ দুটো।

সঞ্জীব লেখা শেষ করিয়া কহিল—এইবার আমি লিখি—মায়ের গরদের থান একখানা, আটপৌরে দু'জোড়া—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—আটপৌরে একজোড়া লেখ, আমার কাপড় জমে আছে, তোর পুরানো কাপড়ে আমার অনেক চলে যায় যে। আর তোর পুরানো কাপড় আমায় সব দিয়ে যাবি। ওয়াড় দেব, সলতে পাকাতে হবে।

সঞ্জীব কহিল—বেশ। ফর্দ শেষ হল তো ?

—হ্যাঁ। আর মশলাপাতি যা, সে গাঁয়ের থেকে আনলেই হবে।

এতক্ষণে অবসর পাইয়া নলিনী বলিল—আমি তা হলে আজকেই যেতে চাই, মা।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—পূজোর পর যাবে। চারদিন পর পূজো, এ সময় ঘর থেকে কাউকে যেতে দিতে আছে ?

নলিনী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল—তা হোক, আমি তো দৈবক্রমে আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছি, আমার যাওয়া-আসায়—

বাধা দিয়া মা বলিলেন—বড় জেদী মেয়েছেলে তোমরা বাপু একালের। পূজোর সময় কুকুর বেড়াল মানুষ বাড়ি থেকে তাড়ায় না, তা তুমি তো মানুষ। না বাছা, তুমি তো মানুষ, ওসব মতলব ছাড় তুমি। তিনি চলিয়া গেলেন।

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু !

সঞ্জীব বলিল—এ ক'দিন এখানেই থেকে যান।

—না।

মৃদুস্বরে সঞ্জীব কহিল—আপনার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে এখানে ?

দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—হ্যাঁ। অশুচির মত—

বিবর্ণমুখে সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি আপনাকে বলেছিলাম—

—হ্যাঁ বলেছিলেন। কিন্তু অশুচি অস্পৃশ্যকে এত সেবাযত্ন করে আরো অপমানের বোঝা অসহ্য করে তুলবেন এ তো বলেন নি। সঞ্জীববাবু, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

ও-ঘর হইতে মা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো ও মেয়ে, তোমার ময়লা কাপড়চোপড় কি কি আছে বের করে দাও দেখি। আজ সব ধোপার বাড়ি যাবে। পূজোর পর আট দিন আবার কাপড় দিতে নেই।

নলিনী উত্তর দিল না।

সঞ্জীব কহিল—উনি আজই চলে যাবেন, মা।

ভ্রূকুটি করিয়া মা বলিলেন—যাব বললেই যাওয়া হয় না। আমার সংসারেরও একটা কল্যেণ-অকল্যেণ আছে। আর বলি হ্যাঁগা বাছা—তোমাকে কি এখানে কেউ কাঁটার ওপর বসিয়ে রেখেছে যে, যাই-যাই ছাড়া আর কথা নেই তোমার ? এস জল খাবে এস, আর কি কি ময়লা কাপড় আছে বের করে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে কহিল—আমার কাপড় তো এই—ওই একখানি ছাড়া—

মা বলিলেন—ওরে সঞ্জীব, গাঁয়ের দোকান থেকেই ধোওয়া ধুতীর কাপড় একজোড়া এনে দে এখুনি। সেমিজ আনবি ছুটো। ওগো বাছা, এস না, তোমার জলখাবার হাতে

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি ? বড় বেয়াড়া স্বভাব তোমাদের।

নলিনীকে উঠিতে হইল।

সঞ্জীব হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। আহার নলিনীর মুখে উঠিতেছিল না। বার বার ভিতরের উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দু'চোখের তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া প্লাবন বহাইতে চাহিতেছিল।

সঞ্জীব ব্যস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এখনও খাওয়া হয় নি ! নিন নিন, শেষ করে নিন। একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিল। সঞ্জীব কহিল, বাগ্দীপাড়ায় একটা ডেলিভারী কেস আছে। কাল সকাল থেকে ব্যথা খাচ্ছে।

নলিনী আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতেছিল, মা পাশ হইতে বাধা দিয়া কহিলেন—আগে খেয়ে নাও, তারপর যাবে। কতক্ষণে হবে তার ঠিক কি ?

নলিনী কহিল—আর আমি খেতে পারব না, মা।

মা কহিলেন -খেয়ে নাও বলছি, খুব খেতে পারবে। নইলে আমি জোর করে খাইয়ে দেব তোমাকে। আমি এখনও স্নান করি নি তা মনে রেখো।

নলিনী আবার বসিল।

রোগিণীর অবস্থা সত্যসত্যই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পরমায়ুর বলেই হউক আর নলিনীর কৃতিত্বের জন্যই হউক নলিনী নিরাপদে প্রসব করাইয়া হাসিমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সঞ্জীব কহিল—আপনার মুখের হাসিতে বুঝতে পারছি—সংবাদ সুসংবাদ।

উচ্ছ্বসিত হইয়া নলিনী বলিল—ভগবানের দয়া, আমার শক্তিতে কিছু হত না সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভগবানকে মনে মনে প্রণাম করুন। হাত আপনার ক্লেদাক্ত, কপালে স্পর্শ করে সেখানে ক্লেদের ছাপ মারবেন না।

নলিনী নিষেধ মানিল না। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—এ ক্লেদের ছাপ ধুলে মুছে যায় সঞ্জীববাবু।

কিন্তু উত্তাপ হইতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সঞ্জীব বাধা দিয়া বলিল—হাত-পা ধুয়ে ফেলুন আগে।

নলিনী দেখিল সাবান, তোয়ালে, গামলায় জল, সব প্রস্তুত হইয়া আছে। গামলার জল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। তাহারই একপাশে একখানা নতুন ধোওয়া-সুতীর লালপাড় শাড়ি ও একটি সেমিজ রাখা হইয়াছে।

সঞ্জীব কহিল—বসুন আপনি, আমি জল তুলে দিই।

নলিনী লজ্জিত সুরে বলিয়া উঠিল—না না, সে হবে না। আপনি জল তুলে

দেবেন সে হবে না।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেন ?

সলজ্জ ভাবে নলিনী বলিল—না ছি, পুরুষের সেবা কি স্ত্রীলোকে গ্রহণ করতে পারে সঞ্জীববাবু ?

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—আপনি ভুল করছেন, আমরা কর্মসাথী, কমরেডস।

খাস বৈঠকখানার বারান্দার ইজিচেয়ারের উপর বসিয়া মহেন্দ্রবাবু দাঁত দিয়া আঙুলের নখ কাটিতেছিলেন। এই আচরণটুকু তাঁহার গভীর চিন্তামগ্নতার পরিচায়ক। সম্মুখে টি-পয়টার উপর কয়েকখানা বই পড়িয়া ছিল। একখানা তাঁহার Criminal Procedure Code, একখানা How to make money, একখানা Goat-keeping, অপর দুইখানা বাংলা বই—একখানা জ্যোতিষ দর্পণ, অপরখানি সংক্ষিপ্ত বেদান্তসার।

মিত্তির মশায় আসিয়া আভূমি-নত নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বাবু সজাগ হইয়া উঠিলেন। খাড়া হইয়া বসিয়া কহিলেন—এই যে এসেছ। মামলাটার কতদূর কি হল ?

মিত্তির মশাই বলিল—পূজোর ছুটি সামনে, ছুটির আগে আর কিছু হবে না। তবে রিপোর্ট সেখানে গিয়েছে—পুলিস অফিসে।

বাবু আবার নখ কাটিতে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পর কহিলেন—মামলাটি চালিয়ে ফল নেই। ওটা এইখানেই চেপে দাও। অনেক কিছু কেলেঙ্কারি হবে—দারোগাবাবুর কাছে একবার যাও তুমি। আর ধীরেন কেরানীকে একবার ডেকে দাও।

মামলায় মিত্তির মশায়ের নিষ্ঠা প্রবল। সে কহিল—আজ্ঞে থেফ্‌ট্ কেস, ডায়েরী করে মামলা তুলে নিতে গেলে শেষে যে বিপদে পড়তে হবে। সঞ্জীব পিছনে রয়েছে, যদি পাল্টা মামলা কিছু রুজু করে ?

বাবু কহিলেন—হুঁ। তা হলে লেডি ডাক্তারকে বাদ দিয়ে হাসপাতালের চাকরটাকে ঠেলে দাও। যন্ত্রপাতিগুলো কাউকে দিয়ে ওর ঘরে রাখিয়ে দাও। জেল হলে ওর মেয়ে-ছেলেকে কিছু টাকা দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সার্চ করিয়ে দাও—বুঝলে ?

মিত্তির মশায়ের তাহাতে আপত্তি ছিল না। ব্যক্তিবিশেষকে আসামী করিতে মস্তিষ্ক-পীড়ার তাহার কোন হেতু ছিল না। মামলা চলিলেই তাহার হইল।

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—যে আজ্ঞে। নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে ডাকিয়া বাবু বলিলেন—ধীরেন কেরানীকে পাঠিয়ে দাও। তারপর জ্যোতিষ দর্পণখানা তুলিয়া লইয়া কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া একটা নির্দিষ্ট স্থান নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতে বসিলেন। স্থানটায় Napolean's Fate Book-এর প্রশ্নোত্তরে মীমাংসার নিয়ম ও কুণ্ডলীচক্র অঙ্কিত ছিল। কয়েকবার বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে অন্তরের কোন গোপন সমস্যার

ফলাফল দেখিলেন। হয়তো উত্তর মনঃপূত হইল না, বইখানাকে সজোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া খুলিলেন বেদান্তসার বইখানা। বেদান্তেও বোধ করি চিত্ত স্থির হইল না।

বই বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খুলিলেন বোতলের ছিপি। গ্লাস দুই পানীয় পান করিয়া খাটখানার উপর বসিয়া গুনগুন করিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন। আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের গান একখানি।

বাহিরে আসিয়া দুর্বল কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়ার ইঙ্গিতে ধীরেন কেরানীকে কহিলেন—ও তুমি!

মাথা চুলকাইয়া উঠিল।

বাবু বলিলেন—শোন, এক কাজ কর দেখি। নূতন যে অ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটি হয়েছে সেই সোসাইটির তরফ থেকে আমাদের সঞ্জীব মুখুজ্যেকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে এস। লেখো যে আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা যে আপনার মত কর্মী এই সোসাইটির ভার গ্রহণ করেন। আপনার সম্মতি পেলে আমরা সেই মত ব্যবস্থা করব। বুঝলে?

ঘাড় নাড়িয়া বেচারী ধীরেন জানাইল—হ্যাঁ, সে বুঝিয়াছে।

হাতের নখ কাটিতে কাটিতে বাবু বলিলেন—এই বেলাতেই পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?

সম্মুখের প্রকাণ্ড হাতাটার ওপাশেই সরকারী রাস্তার ওপর একটা কোলাহল জাগিয়া উঠিতেই কথাটা আর অগ্রসর হইল না। দেখা গেল প্যাকাটির মত একটা মানুষ গলা ফাটাইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতেছে আর লাফ মারিয়া মারিয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে। লোকটা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, জান না, বেটা তুমি আমাকে জান না! ধারো না তুমি আমার কাছে, বেটা বদমাশ? নালিশ করব আমি। যা-তা পেয়েছ তুমি আমাকে? আমার নাম এককড়ি গাঙ্গুলী।

বাবু কহিলেন—দেখ তো হে—কার সঙ্গে কি হল গাঙ্গুলীর?

ধীরেন কহিল—ডাকব এখানে?

হাসিয়া বাবু কহিলেন—ডাকবে বৈকি। ওর আগমন-সংবাদ জানাবার জন্যই ও ঠিক এই জায়গাটিতেই এমন করে লাফ মেরে চীৎকার করছে। ডাক এখানে।

ধীরেন অগ্রসর হইয়া গেল। তখনও গাঙ্গুলী চীৎকার করিতেছিল এবং লাফ দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে হাতার দেওয়ালের ওপরে তাহার ছোট মাথাটি পুতুলনাচের পুতুলের মত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ সব পরিবর্তিত হইয়া গেল, আস্ফালন নীরব, ছায়াছবির মত গাঙ্গুলীর মাথাও আর উপরে ঠেলিয়া উঠিল না। বাবু বুঝিলেন ধীরেন ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই গাঙ্গুলী হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাবুই প্রশ্ন করিলেন—কি হল কি, গাঙ্গুলী?

গাঙ্গুলী ভণিতা আরম্ভ করিল—আজ্ঞে আপনার রাজ্যের বিচারই এই। বুকে বসে সব দাড়ি ছিঁড়তে চায়। পাওনাদারের পাওনা পাওনাই নয়—সে চোখা কাগজে আছে—ইচ্ছে হয় তো দেব নইলে দেব না। এখন আমার যা পাওনা তাই তুমি দাও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু কহিলেন—এ তো হল ভণিতা। তারপর ঘটনাটা কি শুনি?

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আজ্ঞে এই বেটা তারা মোদক। রমা বলেছিল,—কাকা, খোকার জন্ম চার আনার মিষ্টি নিয়ে এস। খোকা মানে রমার ভাইপো—তাকে সে মানুষ করেছে কিনা। পয়সা বেচারার হাতে ছিল না, বললে—দুদিন পরে পয়সাটা দেব কাকা। তাই বললাম বেটাকে—ওরে, দে চার আনার মিষ্টি। লিখে রাখ্ রমণ দাসের নামে—দুদিন পরে দামটা পাবি। বেটা বলে কিনা—আজ্ঞে না, ধার দিতে পারব না।

মোদক ছোকরাও পিছন পিছন আসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে করজোড়ে কহিল—হুজুর আমি বললাম, আপনার নামে লিখে রাখি। তা গাঙ্গুলী মশায় বললেন—না, আমার নামে লিখবি কেন? ঐ রমণ দাসের নামে লিখে রাখ্। তোর গরজ তো ভারী রে ব্যাটা। মোয়া খাবেন কিষণচাঁদ আর কড়ি গুনব আমি? আজ্ঞে যার তার নামে—।

বাবু বলিলেন—যা তুই, ভাল মিষ্টি এক টাকার বেশ করে হাঁড়িতে বন্ধ করে এখানে এনে দিয়ে যা। খাতায় লিখে রাখবি।

রোকাটা লইয়া মোদক দেখিল—বাবু সহি করিয়াছেন গাঙ্গুলীর হইয়া—শ্রীএককড়ি গাঙ্গুলী, বঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বুকের হাসিটা মুখে ঠেলিয়া উঠিবার পূর্বেই সে চলিয়া গেল।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—মিষ্টিগুলো তোমার বাড়িতে আর খালি হাঁড়িটা ওদের কাছে পৌছবে না তো এককড়ি?

অকস্মাৎ গাঙ্গুলী প্রবল বেগে হাসিয়া উঠিল—সে হাসি তাহার আর থামিতে চায় না। হাসিতে হাসিতেই সে বলিল—বেশ বলেন আজ্ঞে আপনি!

—শুধু হাঁড়িটা ওদের বাড়ি পৌছবে না তো—অ্যা-হি-হি-হি। বেশ বলেন!

তারপর হাস্য সম্বরণ করিয়া কোঁচায় মুখ মুছিয়া বলিল—কেমন বংশ হুজুরদের দেখতে হবে। স্বর্গীয় কর্তাবাবুর রসিকতায় নাকি মরা মানুষকেও হাসতে হত।

বাবু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন—গাঙ্গুলীকে বলিয়া গেলেন—বস তো তুমি, কথা আছে।

অল্পক্ষণ পরেই একটা সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া ইজিচেয়ারটায় চাপিয়া বসিলেন।

গাঙ্গুলী কহিল—আমাকে কি বলবেন বলছিলেন?

সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়িতে ছাড়িতে বাবু বলিলেন—হুঁ। মুখের ধোঁয়াটা নিঃশেষে ব্যয়িত হইয়া গেলে বলিলেন—তুমি শেয়াল পণ্ডিতের কথা জান এককড়ি?

পরম বিস্ময়ে গাঙ্গুলী বলিল—সে আবার কি আজ্ঞে?

সিগারেটে আর একটা টান মারিয়া বাবু বলিলেন—শোন। এক অতি ধূর্ত শেয়াল ছিল। সে নদীর ধারে গর্তের মধ্যে লেজ পুরে দিত। গর্তের মধ্যে কাঁকড়াগুলো রাগে তার লেজের রোঁয়া কামড়ে ধরত। অমনি সে লেজটিকে বের করে কাঁকড়াগুলিকে জলে

করে ভাবত, কি পণ্ডিত সে! বনের সাধারণ জন্তুগুলোও ভাবত—কি বুদ্ধিমান শেয়াল পণ্ডিত! ক্রমশঃ তাহার সাহস বাড়তে লাগল। চাতুরি খেলে কুকুর বাচ্চা—বেড়াল বাচ্চা—ভালুক বাচ্চা খেয়ে দেমাক চরমে তার বেড়ে গেল।

গাঙ্গুলী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে ছেলেবয়সে কি আমোদই হত এই সব গল্প শুনে!

বাবু বলিলেন—দেখ তো ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে বোতল গেলাসটা আছে, নিয়ে এস তো গাঙ্গুলী। কানাই বেটা যে কোথায় যায়!

গাঙ্গুলী বোতল গ্লাস আনিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বোতল গ্লাস লইয়া ফিরিবার মুখে দেখিল, দুয়ারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বাবু দাঁড়াইয়া। ঘরের চারিদেকের অপর দেওয়ালগুলি বন্ধ। এদিকের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলা শিকার করা জানোয়ারের চামড়া টাঙানো রহিয়াছে। তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে দুইখানা তলোয়ার গুণচিহ্ন রেখার মত পরস্পরকে কাটাকাটি করিয়া ঝুলিতেছে। তাহারই উপরে ঢাল। দুয়ারের পাশেই র‍্যাকের মধ্যে সারি সারি বন্দুক ঊর্ধ্বমুখে শোভা পাইতেছে।

বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—শোন তারপর, বাকি গল্পটা তোমায় বলি শোন। বনের কতকগুলো নির্বোধ জানোয়ারকে প্রতারণা করে তার সাধ হল বাঘের সঙ্গে চাতুরী খেলবে। পণ্ডিত নাম তার সার্থক করবে। বাঘের কাছে সে একদিন এল, হুজুর ভাল শিকার আছে। কিন্তু আমার একটা শিকার পাঁকে পড়ে গেছে সেটা উদ্ধার করে দিতে হবে আগে। বাঘ রাজী হল, কিন্তু বললে, আমার শিকার আগে এনে দাও। এই নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হল ক্রমে।

তারপর—অদ্ভুত বিকৃত স্বরে গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার হুজুর, একটু জল—।

ঈষৎ হাসিয়া বাবু বলিলেন—বোতলে জল—গেলাস তোমার হাতেই রয়েছে গাঙ্গুলী, একটু খাও। গলাও ভিজবে···বুকেও একটু বল পাবে।

সত্যই গাঙ্গুলী গ্লাসে পানীয় ঢালিতে ঢালিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করিয়া লইয়া গাঙ্গুলী দুয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিল—বাবুর হাতে বন্দুক। একটা দরজার পিঠে হেলান দিয়া সম্মুখের দরজায় একটি পা তুলিয়া এবার তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দুই হাতে বন্দুকটা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছেন।

চোখে চোখ পড়িতেই বাবু কহিলেন—জান এককড়ি—এই বন্দুকটা আমার বহুদিনের বন্দুক। এতে কখনও একটি গুলিও আমার নষ্ট হয় নি।

গাঙ্গুলী মেঝের উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—দোহাই হুজুর রক্ষে করুন। আমি আজই সন্ধ্যেতক রমাকে এনে দিয়ে যাব। দোহাই হুজুর।

—দেখো!

—নইলে আমার দশটা বাবা।

—আরও চাই আমার, সঞ্জীবের বাপের সেই তমসুকখানা, বুঝলে ?

—সে আমার কাছেই আছে মা-বাপ।

বন্দুক রাখিয়া দিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিয়া বাবু কহিলেন—বাইরে এস।

বাহিরে আসিয়া জোড়হাত করিয়া গাঙ্গুলী কহিল—কিছু দেবেন না হুজুর সঞ্জীবের দলিলটার জন্য ? সুদে-আসলে পাঁচশো হয়েছে হুজুর।

সে বাবুর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

বাবু বলিলেন—পা ছাড় এককড়ি। দেব—কিছু দেব তোমাকে। আজই দেব।

অপরাহ্ণের দিকে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। নলিনী চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া কহিল—একবার রোগীটিকে দেখলে হত যে।

চায়ের পেয়ালাটা লইয়া সঞ্জীব কহিল—সত্যি কথা, চলুন দেখে আসবেন, চলুন।

নিজের জন্য চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে নলিনী বলিল—চলুন। তারপর আবার বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশ কিন্তু আমার বড় ভাল লাগে। লাল মাটির দেশ—তারই মাঝে মাঝে সবুজ মাঠ বড় চমৎকার।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—যাবেন বেড়াতে, আমার সঙ্গেই চলুন না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মা রাগ করবেন না তো ?

সম্মুখে ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে মা পূজার পাতি গুছাইয়া ভাণ্ডারে তুলিতেছিলেন। সঞ্জীব ডাকিল—মা !

—কি রে ?

—আমাদের মেয়ে-ডাক্তারকে আজ একবার আমাদের দেশের মাঠ দেখিয়ে নিয়ে আসি। কোন কাজ নেই তো তোমার ?

—ও আবার আমার কি কাজ করবে ? তা যা না। যাবার মুখে বাগ্দীপাড়ার হারাণকে বলে যাস বাগ্দী-বউকে যেন পাঠিয়ে দেয় একবার। আর দুটো মাছের জন্য বলে যাবি—নলিনীর বড় কষ্ট হচ্ছে খাবার।

সঞ্জীব নলিনীকে তাড়া দিয়া বলিল—নিন, নিন—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন, দেরি করবেন না।

একটু উচ্ছ্বসিত ভাবেই নলিনী বলিয়া উঠিল—আগে আপনি নিন—চা খেয়ে পেয়ালাটা আমায় দিন দেখি। চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে আনতে হবে না ?

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার এঁটো কাপ আমি ধোব আজ—আপনার কাপটা যদি আমায় না দেন তো নিজে ধুয়ে ফেলুন।

হাতের কাপটা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া নলিনী বলিল—ভারী অবাধ্য আপনি—

কথাটা অর্ধসমাপ্তই থাকিয়া গেল। পরমুহূর্তেই সে একরকম ছুটিয়া খিড়কির পথে

কাপ-কেটলী হাতে বাহির হইয়া গেল। ঘাট হইতে ফিরিয়া সে একেবারে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সঞ্জীব হাঁকিল—হল আপনার? কোন উত্তর আসিল না। আবার কিছুক্ষণ পরে সে ডাক দিল—আসুন, বেলা যায় যে!

নলিনী বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—চলুন।

তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সঞ্জীব মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বাঃ চমৎকার! চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে। নার্সের বাংলা সংস্করণ দেখেছি। কিন্তু রূপে শোভায় এমন সেবিকা-মূর্তি এর আগে আমি দেখি নি মিস গাঙ্গুলী।

নলিনীর পরিধানে ছিল শুভ্র বেশ—হাফ-হাতা একটি ব্লাউস, তাহার উপর মিহিপাড় সঞ্জীবের ধুতি একখানি হালফ্যাসানের বেড় দিয়ে পরা, পায়ে স্যাণ্ডেল, আর মাথায় ছিল সাদা একখানি রুমাল ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা। তাহার দীঘল সুশ্যাম দেহখানি শুভ্র পরিচ্ছদে সত্যই মানাইয়াছিল চমৎকার। কিন্তু মাথায় ওই ইরাণী মেয়েদের ছাঁদে বাঁধা রুমালখানি তাহার সে শোভা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নার্সদের মত মস্তক-আবরণ বাঙালীর মেয়েকে এমন মানায় না।

নলিনীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—ওতে আমি লজ্জা পাই সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আমরা কমরেড মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তা হলেও আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ।

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া সঞ্জীব বলিল—না মিস গাঙ্গুলী, কর্মক্ষেত্রে কর্মের সমারোহের মধ্যে থাকে শুধু মানুষ। কর্মের প্রকৃত অধিকার-বোধ ছাড়া অপর সমস্ত সত্তা ভুলে যেতে হয়। কমরেড কথাটির গুরুত্ব বড় বেশী।

সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া নলিনী দেখিল—প্রশান্ত উচ্ছ্বাসহীন মুখ।

ধীরে ধীরে সে বলিল—কিন্তু মার্জনা করবেন সঞ্জীববাবু, সেখানে তা হলে তো সৌন্দর্যের মোহে উচ্ছ্বাস প্রকাশের অধিকার বা অবকাশ না থাকাই উচিত।

দূরে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব বলিল—উচ্ছ্বাস নয়, আনন্দ। আনন্দ উপলব্ধির পথ যে রোধ করা যায় না মিস গাঙ্গুলী। এ পথ রোধ করতে পারে কে জানেন—পারে এক মৃত্যু। আর পরস্পরকে দেখে আনন্দ পাওয়াই হল বন্ধুত্ব। কমরেডস হতে হলে ওটা চাই, না হলে চলে না।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। কেন জানি না কোন যুক্তিই তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিল না। সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত লোক-চলা আঁকা-বাঁকা পথে সঞ্জীব চলিয়াছিল আগে, সে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল পিছনে পিছনে।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কি হারাণদা, রোগী কেমন আছে?

নলিনী দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল বাগ্দীপাড়ায় তাহারা আসিয়া গিয়াছে। সম্মুখের বড় বাঁশ-ঝাড়ের ছায়াঘন পরিচ্ছন্ন তলদেশটিতে তাহাদের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। পাশেই অদূরে

তার পাঁচটি দিগম্বর ছেলে পরস্পরের গায়ে ধূলা ছিটকাইয়া কলহ করিতেছিল। বড় ছেলেটি অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—এই এই দাদাঠাকুর আইচে। চুপ, চুপ, সব চুপ কর।

একজন বলিল—এই শালা সতে, হুঁকোটা নামা কেনে। শালা টানছে দেখ লবাবের মত।

হারাণ সঞ্জীবকে কহিল—রোগী আপনাদের কিপাতে ভালই, দাদাভাই। আহা মেম ডাক্তারের যে যতন।

স্মিত হাস্যে নলিনী কহিল—চল, একবার দেখে আসি চল।

হারাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—এ অবেলাতে থাক্ মা। ছুঁলে তো চান করতে হবে। কাল বরং চানের আগে—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—না, না, না, কে বললে আমাকে চান করতে হবে? মানুষ ছুঁলে কি মানুষকে চান করতে হয়?

হারাণ বলিল—তবুও এ বেলা থাক মা। কাল সকালেই দেখবেন। আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের পুজো-আচ্চা হবে।

নলিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই অস্পৃশ্য জাতি—যাহারা আপন অস্পৃশ্যতার কাল্পনিক অপরাধ নির্বিবাদে মাথায় করিয়া অসঙ্কোচে বিশ হাত দূরে সরিয়া যায়—তাহাদের নিকটও কি সে অস্পৃশ্য! ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—বেশ তো সঞ্জীববাবু, আপনি একবার পাল্‌সের বিটটা গুনে দেখে আসুন না।

জোড়হাত করিয়া হারাণ বলিল—আজ থাক্ মা, যেদিন আমাদের দেবতার পুজো হয় সেদিন ডাক্তার কবরেজ সব বন্ধ। তাঁর উপর নির্ভর করে চিরদিন তো থাকতে পারি না, একটা দিন কি একটা বেলা তাও যদি না থাকতে পারি তবে আর তাঁকে মান্য করা কেনে।

কথা কয়টিতে নলিনীর মনের গ্লানি এক মুহূর্তে যেন ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বলিল—তাই হবে হারাণদা। তোমাদের বউকে একবার মা ডেকেছেন। কিছু মাছ দিয়ে আসতে বলেছেন।

তারপর সঞ্জীবের হাতখানি নিঃসঙ্কোচে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—আসুন, আসুন সঞ্জীববাবু, বেড়াবার সময় চলে যাচ্ছে। আপনাদের দেশ আমার বড় ভাল লাগে।

চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিল—কি কুসংস্কার দেখুন। এ ওদের ভাঙা দরকার।

দৃঢ়কণ্ঠে নলিনী বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু, ওখানে ওদের চেয়ে আপনি অনেক দুর্বল। ওখানে ধরে নাড়া দিতে গেলে অক্ষমতায় নিজের কাছেই লজ্জা পাবেন আপনি।

সঞ্জীব মৃদু স্বরে কহিল—কিন্তু ভাঙতে হবে ওদের আত্মধ্বংসী হীনত্ব বোধ। ওদের মধ্যে আশ্রয় গেড়ে রয়েছে।

নলিনী উচ্ছলিত ভাবে বলিয়া উঠিল—যা করবেন ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে করুন সঞ্জীববাবু। ভুলবেন না এ ভারতবর্ষ—আর্যভূমি।

সঞ্জীব কথায় বাধা দিল, সে বলিল—মাটি মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীর একটা অংশ। রাজা ভরতের শাসনাধীন থেকে নাম পেয়েছে ভারতবর্ষ।

নলিনী আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—ভুল, ভুল, এ আপনার ভুল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—ভুলের পর ভুল রচনা করেই তো মানুষ প্রগতির ইতিহাস রচনা করে চলেছে। হয়ত আমার মত ভুল। কিন্তু সে নিয়ে ঝগড়া করার যোগ্য স্থান এটা নয়, মিস গাঙ্গুলী। ওরা সব কেমন ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে আছে দেখুন।

নলিনী দেখিল উলঙ্গ শিশুর দল হাঁ করিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

যে ছেলেটা প্রকাণ্ড হুঁকাটা টানিতেছিল সে হুঁকা পর্যন্ত টানিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ঘরের দুয়ারে দুয়ারে শান্ত বধূর দল অবগুণ্ঠনান্তরাল হইতে কৌতুকোজ্জ্বল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে।

সঞ্জীব বলিল—তার চেয়ে চলুন নির্জন মাঠে গলা ফাটিয়ে তর্ক করা যাবে।

একটা উলঙ্গ ছেলে অকস্মাৎ হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল—হি হি হি, বর-কনেতে ঝগড়া লেগে গেছে মাইরি—হি হি হি।

মুহূর্তে নলিনী আপনার হাতখানা টানিয়া লইল।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আপনি ছেলেমানুষ, মিস গাঙ্গুলী। ওই হাড়িদের কথায় কান দেন আপনি?

গ্রামের বসতি ছাড়াইয়াই আশ্বিনের সবুজ অবারিত মাঠ বিপুল আলস্যে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটা শ্রেণীবদ্ধ তালগাছ শরতের প্রসন্ন নীলাভ শূন্যপথে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, সম্মুখে দিকচক্রবালে গ্রাম-বন-শোভার ঘন সবুজের সহিত আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ।

চলিতে চলিতে নলিনী বলিয়া উঠিল—সকল সত্তা ভুলে কমরেড হওয়া যায় সঞ্জীববাবু, কিন্তু যাকে আপনি অস্বীকার করতে চান সেই ঈশ্বরকে বুকের মধ্যে অহরহ অনুভব করা চাই।

সঞ্জীব বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিয়া গেল—হারাণের কথা শুনলেন? সে সত্যি সত্যিই আজ ভগবানের উপর নির্ভর করে আছে। তাঁকে আজ সে অনুভব করছে। তাঁরই ছোঁয়াচ আমাকেও লাগল। মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত সত্তাকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম এতগুলো লোক আমাদের দিকে চেয়ে আছে। নিঃসঙ্কোচে আপনার হাত ধরলাম।

মৃদু হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু মনে করবেন না। আপনি বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল।

হাসিমুখেই নলিনী উত্তর দিল—সেন্টিমেন্ট ভাবের উচ্ছ্বাসই হল জীবনের লক্ষণ সঞ্জীববাবু। সমুদ্রে নদীতে তাই প্রাণের উচ্ছ্বাস ওঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গে। ঘটিবাটির জলে তরঙ্গ ওঠে না। মাটির বুকে ওঠে ফসলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু পাথরের বুকে ওঠা শেওলার দাগও স্থায়ী হয় না। তাতে গড়া হয় শুধু মৃতের ওপর কবর, স্মৃতিমন্দির।

সঞ্জীব মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

সবুজ মাঠের বুকচেরা আলপথ পায়ে পায়ে শেষ হইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। দুধারের ঘন সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া বিসর্পিল-গতি লাল কাঁকড়ের পথ ক্রমশঃ উঁচু হইয়া চড়াইয়ের উপরে উঠিয়াছে। দুধারে বনফুলের গাছগুলি সবুজ ফলভারে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় শিরীষ, বেল, অশ্বত্থ ও আউচ ফুলের গাছ। আউচ ফুলের গাছগুলি মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা ফুলের স্তবকে স্তবকে যেন আলো হইয়া আছে। পথের ধারেই হাতের কাছে একটা গাছ হইতে নলিনী একটা ফুলের স্তবক ভাঙিয়া লইল।

একটি সরু ডালের মাথায় অজস্র ফুলে পাতায় কে যেন তোড়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

স্তবকটা দেখাইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—এই ফুলের গোছাটাকে কি বলবেন সঞ্জীববাবু? এ থেকে বোধ হয় ফল হয় না। একে কি বলবেন প্রকৃতির সেন্টিমেন্ট-এর সৃষ্টি, শক্তির অপচয়!

স্বভাবগত মৃদু হাস্য সহকারে সঞ্জীব উত্তর দিল—প্রকৃতির সেন্টিমেন্ট কখনও মাত্রা ছাড়ায় না নলিনী দেবী, মাত্রাবোধেই সংসারে হয়েছে ছন্দের সৃষ্টি। এই ছন্দকে অতিক্রম করলেই সংসারে যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। সেন্টিমেন্ট-কে আমি নিম্নস্থান দিই না। সেন্টিমেন্ট-ই সংসারের বৃহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট অতিমাত্রায় হলেই কর্ম হয় পণ্ড। প্রকৃতিকে সর্বশক্তির মূল-আদ্যাশক্তি বলে মানি আমি। কিন্তু ইচ্ছাময়ী বলে ফুলে ফলে পূজা আমি করতে পারি নে।

চড়াইয়ের মাথায় উঠিয়া পথটা প্রকাণ্ড একটা বাঁক ফিরিয়াছে। সঞ্জীব বলিল—আসুন বাঁ দিকে ভাঙি। আর পথ নয়, অসমতল প্রান্তর। একটু সাবধানে চলবেন।

নলিনী সঞ্জীবের কথাই চিন্তা করিতেছিল। তাহার কথায় সে চিন্তা ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত করিল। লাল কাঁকরের টিলা, ছোট পাহাড়ের মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটাবন। লাল মাটির বুকটা কালো রঙের গোল কাঁকর আর নানা বর্ণের পাথরে সমাচ্ছন্ন। সন্তর্পণে স্যাণ্ডেল চালাইয়া টিলার মাথার উপর উঠিয়া নলিনী মুগ্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় টিলার পর টিলা, এ উহার বুকে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা টিলার মধ্যস্থলে উপত্যকার মত সমতল-ভূমিতে শস্যক্ষেত্রে হিল্লোলিত-শীর্ষ ধান্য-লক্ষ্মীর অপরূপ শোভা। ক্ষেত্রগুলির বেড়ায় বেড়ায় তাল-বৃক্ষের সারি।

নলিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—চলুন, চলুন, আগে ওই টিলাটার ওপরে গিয়ে উঠি।

টিলাগুলির গা বাহিয়া ঝর্ণার জলধারার পথে পথে নদীর জন্মকথার ইতিবৃত্ত লেখা। ক্ষুদ্র রেখাগুলি নীচে নামিতে নামিতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমশঃ গভীর ও পরিসর হইয়া চলিয়াছে। এ যেন ভূপৃষ্ঠের একখানি মানচিত্র।

নালার গর্তে নামিয়া পড়িয়া নলিনী বালুকারাশির উপর ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। নালাটার দুই পার্শ্বে জলে-কাটা মাটির গায়ে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের কোনটি লাল, কোনটি প্রগাঢ় হলুদ, কোনটি কালো। এখানে ওখানে বিবিধ বর্ণ ও আকারের উপলখণ্ডের স্তূপ। বাছিয়া

বাছিয়া নলিনী পাথর কুড়াইয়া আঁচল ভরিতেছিল। সহসা একটা কাঁটাবন হইতে ফর ফর শব্দে দুইটা পাখি উড়িয়া গিয়া দূরে টিলার মাথায় বসিয়া কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। নলিনী চমকাইয়া উঠিল।

অদূরে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তিতির পাখি।

নলিনী হাসিয়া আবার পাথর কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

পিছন হইতে সঞ্জীব ডাকিল—একটা জিনিস দেখুন।

নলিনী দেখিল সঞ্জীবের হাতে বড় একটা লাল কাঁকরের চাপ। একটা পাথরের উপর সেটাকে রাখিয়া আর একটা পাথর দিয়া আঘাত করিতেই কাঁকরের ঢেলাটা ভাঙিয়া চুর চুর হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল সুকোমল গভীর রক্তবর্ণের মৃৎপিণ্ড। সেই মৃৎপিণ্ড দিয়া একটা পাথরের গায়ে গভীর রক্তবর্ণের দাগ টানিয়া দিয়া সঞ্জীব বলিল—এই হল গিরিমাটি। হলুদ রঙের এই মাটিও পাওয়া যায়।

নলিনী আবদারের সুরে বলিল—দিন না, দিন না দেখে দেখে, সংগ্রহ করে দিন না সঞ্জীববাবু।

কয়েকটা টুকরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া সঞ্জীব বলিল—চলুন ওপরে ওঠা যাক। সরু একখানি রাস্তা। দু-পাশে খৈরী কাঁটার বন। মাঝে মাঝে শরবন বায়ু আন্দোলনে শির শির করিয়া দুলিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ডাক্তার মানুষ আপনি—একটা ওষুধ চিনে রাখুন। এর নাম হচ্ছে ষড়পঙ্ক—ব্যথার খুব ভাল ওষুধ।

নলিনী বিস্মিত হইয়া কহিল—এ কি শরবন নয়!

কোন উত্তর না দিয়া একটা পাতা ছিঁড়িয়া সঞ্জীব দু হাতে দলিয়া নলিনীর নাকের কাছে ধরিল। চমৎকার একটা গন্ধে নলিনীর বুক ভরিয়া গেল। গোটাকয়েক পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া নলিনী প্রশ্ন করিল—কি নাম বললেন, ষড়পঙ্ক—নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু এদিকে দেখুন—সূর্য অস্ত চলেছে। তখন তাহারা টিলাটার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে।

নলিনী বলিয়া উঠিল—কিন্তু এ কি চমৎকার ফল সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব ঘুরিয়া দেখিল একটা বড় খৈরী কাঁটার গাছ আচ্ছন্ন করিয়া একটা লতা উঠিয়াছে, আর সেই লতায় ধরিয়া আছে অপরূপ রাঙা রাঙা ফল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—এ ওর ধার করা রূপ নলিনী দেবী। আপনাদের অধর শোভা চুরি করে ওর এত শোভা—ওর নাম হচ্ছে বিম্বফল।

নলিনী কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল—আমরা কমরেড সঞ্জীববাবু।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—নিশ্চয়। নইলে বিম্বফল না বলে বলতাম তেলাকুচার ফল। চলিত ভাষায় আমাদের এখানে ওর নাম তেলেকুচা।

দূরে আর একটা টিলার উপর দিয়া একখানা গরুর গাড়ি চলিয়াছিল। তাহারই পাশে সাঁওতালদের একটা পল্লী। দিবসান্তে কুটীরে কুটীরে ধোঁয়া উঠিতেছে, এতক্ষণে উহাদের রান্না চড়িল। সম্মুখে একটা টিলার অন্তরালে সূর্য অস্তে চলিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিলেও পূর্বদিগন্তে শুক্লা শারদ চতুর্থীর ক্ষীন চন্দ্রকলার আলোক দেখা দিয়াছিল। সন্তর্পণে পথ চলিতে চলিতে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—কে?

ওদিক হইতে একজন মানুষ চলিয়া আসিতেছিল। সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কে? কে তুমি?

তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবেই বলিল—স্ত্রীলোক বলে বোধ হচ্ছে!

নলিনী অগ্রসর হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত মানুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—কে, রমা?

কোঁপাইয়া কাঁদিয়া রমা কহিল—দিদিমণি!

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে এমন সময় কোথায় চলেছ রমা?

কাঁদিতে কাঁদিতেই রমা কহিল—আমায় বাঁচাও দিদিমণি। আবার গাঙ্গুলী কাকা আমায় বাবুদের বাড়ি পাঠাবে। বাবু বাবাকে টাকা দিয়েছে। বাবা আমায় বিক্রি করেছে, আজই সন্ধ্যেবেলা আমায় নিতে গাড়ি আসবে। তখন আমি বুঝতে পারি নি, আমায় বাঁচাও তোমরা।

নলিনী প্রশ্ন করিল—কিন্তু এ পথে এই সন্ধ্যেবেলা তুমি যাচ্ছিলে কোথায়?

—আমার মাসির বাড়ি। ঐ সামনের গাঁয়ে আমার মাসির বাড়ি।

সঞ্জীব কহিল—সেখানে যাবে তুমি?

আকুলস্বরে রমা বলিল—না, না বাবু। তখন আমি বুঝতে পারি নি। মায়ের জন্য মন কেমন করেছিল তাই চলে গিয়েছিলাম। বাবু!

নলিনী কহিল—সঞ্জীববাবু!

প্রশান্ত স্বরে সঞ্জীব উত্তর দিল—এস রমা।

বিজয়া দশমীর দিন।

এখানে নবপত্রিকা ও ঘট বিসর্জনান্তেই বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হয়, এই চিরদিনের প্রথা। সঞ্জীব বিজয়া সম্ভাষণের জন্য নতুন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া ডাকিল—মা!

কেহ কোন উত্তর দিল না। সে আবার ডাকিল—মা!

এবার সম্মুখের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল নলিনী। বলিল—মা তো এখনও অঞ্জলি দিয়ে ফেরেন নি?

সঞ্জীব সে কথার কোন জবাব দিল না, বলিয়া উঠিল—এ কি, আপনি এখনও কাপড়-

চোপড় ছাড়েন নি যে ?

নলিনী কহিল—কেন ?

—বেশ যা হোক। এত বড় পুজোটা গেল, সে দেখলেন না ! এদিকে দেখি ঈশ্বর পূজায় আপনার দারুণ নিষ্ঠা। তার ওপর আজ বিজয়া-দশমী, বাঙালী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বদিন। আজ নববস্ত্র পরিধান করে নতুন উদ্যম নিয়ে আমাদের হয় নব বৎসর।

নলিনী চুপ করিয়া রহিল। সঞ্জীবের চোখের দৃষ্টি তখন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত, সহজ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে সে দেখিতে পাইত কালো মেয়েটির বর্ণ বিষণ্ণতার ঘন ছায়ায় সজল মেঘের মত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

সে উৎসাহভরেই বলিয়া গেল—দেখবেন, এক্ষুনি রাস্তা দিয়ে দলে দলে গ্রামের লোক দুর্গা মায়ের ঘাটে চলবে। সেখানে জীবনে জয় কামনা করে হাতে অপরাজিতার বলয় পরবে, হরিদ্রার প্রসাদ খেয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। তারপর বিজয়া সম্ভাষণ আরম্ভ হবে। স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে সাজসজ্জা করে বাড়ি বাড়ি প্রণাম করে ফিরবে। পুজো আপনি দেখলেন না—আজ আপনাকে বেরুতেই হবে। কাপড়চোপড়—তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বেই নলিনী ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঞ্জীব বিস্মিত হইয়া গেল। মেয়েটির গতির মন্থরতা এতক্ষণে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া সে ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী ! কোন উত্তর আসিল না। সঞ্জীব এবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নলিনী স্তব্ধ হইয়া তক্তাপোশখানির উপরে বসিয়া ছিল। সঞ্জীব স্নেহকোমল স্বরে আবার ডাকিল—নলিনী দেবী !

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া নলিনী তাহার দিকে চাহিল। বলিল—বলুন।

—কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলুন, বিজয়ার সময় আর বেশী নেই। আজ নতুন সাজসজ্জা করতে হয়, উঠুন।

নলিনী একটু হাসিল—উদয়াকাশের বিলীয়মান তারকার মতই সে হাসি সকরুণ ক্ষীণ। সে হাসিটুকুর রেশ তাহার অধরতটে থাকিতে থাকিতেই সে বলিল—না।

—কেন ? আপনার কি হল ?

অস্থির হইয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, আমায় মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। আমি যেতে পারব না।

তাহার চোখ ছল-ছল করিতেছিল। উচ্ছ্বসিত কয়টি ফোঁটা মাটির উপর ঝরিয়াও পড়িল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত নলিনীর বেদনার কারণটুকু সঞ্জীবের মনে সুপ্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সে নতমুখেই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল।

পিছন হইতে নলিনী বলিল—আমায় একটু কাঁচা হলুদ এনে দেবেন ?

সঞ্জীব বলিল—দেব। কিন্তু মনকে এমন ভাবে পীড়িত করবেন না মিস গাঙ্গুলী। যে ভুল যে ভ্রান্তি পেছনে ফেলে এসেছেন তার দিকে ফিরে চাইতে গেলে সম্মুখের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হয়। তাতে জীবন হয় পঙ্গু। ভুলে যান, ওকথা ভুলে যান আপনি।

অতি কাতরস্বরে পিছন হইতে উত্তর আসিল—পারি নে, পারছি নে, বোধ হয় সে পারা যায় না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব মুখ ফিরাইতে দেখিল, অন্তরের উচ্ছ্বসিত বেদনার আবর্তে ছোট্ট নদীটির মতই সে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নলিনী কাঁদিতেছিল। সঞ্জীব নিকটে দাঁড়াইয়া কোমলস্বরে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—ছি, কাঁদবেন না মিস গাঙ্গুলী, কাঁদবেন না।

নলিনী তবুও কাঁদিতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—কিসের লজ্জা আপনার? কার চেয়ে ছোট আপনি? দয়া মায়া মহত্ব সত্যনিষ্ঠায় আপনি তো কারও চেয়ে ছোট নন। উঠুন, উঠুন, কাঁদবেন না। নলিনীর হাত ধরিয়া সে একবার মৃদু আকর্ষণ করিল।

নলিনী বলিয়া উঠিল—না, না, না। আমায় একটু একা থাকতে দিন।

—দিদিমণি!

ডাক শুনিয়া সঞ্জীব মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া রমা। তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিল—কিছু বলছ রমা?

ত্রস্তভাবে দৃষ্টি নত করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে রমা বলিল—দিদিমণিকে ডাকছিলাম, তা থাক।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ বাড়াইয়া নলিনী বলিল—আমায় ডাকছ রমা?

রমা তখন চলিয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব বলিল—আমি যাই তা হলে। মনকে কিন্তু এমন ভাবে অনর্থক পীড়ন করবেন না। আমার অনুরোধ রইল।

সে চলিয়া গেল। নলিনী আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—রমা! রমা!

দরজার পাশ হইতে রমা উঁকি মারিয়া বলিল—দাদাবাবু চলে গিয়েছেন দিদিমণি? আমি যাব?

এই মুহূর্তে অন্য কেহ এ কথা বলিলে নলিনী অপমান বোধ না করিয়া পারিত না। কিন্তু এই নির্বোধ মেয়েটার কথায় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। সে কহিল—হ্যাঁ চলে গেছেন তিনি। এস তুমি। কিছু বলছিলে আমায়?

ঘরের মধ্যে রমা প্রবেশ করিয়া বলিল—বিজয়া দেখতে যাবে না দিদিমণি? কাপড়চোপড় ছাড়!

নলিনী কহিল—না, ভাই, আমি যাব না। আমার শরীর খারাপ করেছে, তুমি বরং যাও।

রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিল—তোমার ওই পুরানো কাপড় আর সেমিজটা আমি আজ পরব দিদিমণি? আমার কাপড়টা বড় মোটা। আর তোমার কাপড়ের পাড়টা কেমন ভাল!

নলিনী পরম স্নেহভরে স্বল্প হাস্যের সহিত ঘাড় দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রবল উৎসাহে রমা বলিয়া উঠিল—নেব দিদিমণি ?

হাসিয়া নলিনী স্পষ্টাক্ষরে সম্মতি দিল—নাও। তোমায় দিলাম ও-গুলো।

চঞ্চলা বালিকার মতই লঘুপদে রমা চলিয়া গেল। ওই চঞ্চল গতির স্পর্শ ছোঁয়াচের মত যেন নলিনীর মনে রঙ ধরাইয়া দিল। সে চাহিয়া রহিল রমার ওই চঞ্চল-গতি-চিহ্নিত গমন-পথটির দিকে, মৃদু হাসির রেশটুকু মুখে তার লাগিয়াই ছিল। কতক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সম্মুখের খোলা জানালার দিকে সে চাহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কেন রমা হইতে পারে না ? অপরাধ-বোধহীন এমন একটি অকুণ্ঠিত শিশুচিত্ত কেন তাহার নয় ? মনশ্চক্ষুর কেন এমন একটি অকলঙ্ক শুভ্র দৃষ্টি তাহার নাই ? রমার দৃষ্টিতে তাহার গাঙ্গুলী কাকা ভাল মানুষ, মহেন্দ্রবাবুকেও সে ভাল লোক ভাবে।

অকস্মাৎ একটি কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—রমা ! রমা ! রমা !

হাসিমুখে রমা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমায় ডাকছ দিদিমণি ?

নলিনী দেখিল, তাহার কাপড় বদলানো হইয়া গিয়াছে—পরনে তাহার সেমিজ আর তাহারই মাদ্রাজী শাড়িখানা। অপটু হাতের বিন্যাসে সেমিজটা কুঁকড়াইয়া গিয়াছে। পরিধান করিবার অপকর্ষ ভঙ্গিতে কাপড়খানা শ্রীহীন ভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু রূপ যাহার আছে—পরিচ্ছদ বিন্যাসের শ্রীহীনতা তাহার শ্রীকে পীড়িত করিতে পারে না। এই বেশ-বিন্যাসেই তাহাকে মানাইয়াছে বড় চমৎকার।

নলিনী বলিল—আমার তখন মনে হয় নি রমা। তুমি সঞ্জীববাবুকে জিজ্ঞাসা করে তবে যেন বেরিও।

রমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন দিদিমণি ?

একটু বিরক্ত হইয়া নলিনী কহিল—এত ছেলেমানুষ তো তুমি নও, রমা ? জান তো—এটা হল মহেন্দ্রবাবুর রাজ্য ! তার বিপক্ষে যে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা না করে বেরিয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কি হবে ?

রমা নীরবে চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ পর আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দাও দিদিমণি।

কেন কে জানে, বেশ-বিন্যাসপরায়ণা রমাকে নলিনীর বড় ভাল লাগিতেছিল না।

নলিনী এবারও বিরক্তিভরে বলিল—কেন ? তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর না ?

রমা মুখ নামাইয়া চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে বলিল—আমার বড় লজ্জা লাগছে দিদিমণি। তখন দাদাবাবু কি মনে করেছেন বল তো ?

—কখন ? এই ছন্নছাড়া মেয়েটির কথাবার্তার অর্থও যেন ছন্নছাড়া। সে অর্থ নলিনীর বোধগম্য হইল না। সে জিজ্ঞাসা করিল—কখন ?

—যখন সেই তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি এসে পড়লাম। রমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুস্পষ্ট লজ্জার রেশ গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছিল।

কঠিন স্বরে তিরস্কার করিয়া নলিনী বলিয়া উঠিল—ছি রমা, তুমি এত নীচ!

রমার মুখ ম্লান হইয়া গেল—সে সকরুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে চেষ্টা করিল নলিনীর মুখের দিকে। কিন্তু পারিল না, অবশেষে নতমুখেই মন্থর পদক্ষেপে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আর কখনও বলব না দিদিমণি।

নলিনী একান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিল—এই রমা! হায় রে হতভাগ্য মানুষ! পাপকে এড়াইবার পথ নাই—কোন পথ নাই! মনের কোন অন্ধকার কোণে সে লুকাইয়া থাকে, অকস্মাৎ সুযোগমত বীভৎস হাসি হাসিয়া মুখ তুলিয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে। চিন্তা করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার করিয়া মন চলিয়া যায় কত দূর-দূরান্তর। একসময় তাহার মনে হয় ইহার জন্য দায়ী মানুষ নিজে। শিক্ষা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের প্রবেশের গোপন পথ রচনা করিয়াছে সে-ই স্বয়ং! রমার বুকেও সে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে।

বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিতেছিল—সঞ্জীববাবু! সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব বাড়িতে ছিল না। মাথায় ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিয়া মা দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বর অপেক্ষা উচ্চকণ্ঠেই কহিলেন—কে?

—আমি মহেন্দ্রবাবুর কর্মচারী।

মা বলিলেন—সঞ্জীব তো বেরিয়ে গেছে বাবা। সে ফিরে আসুক, বলব তাকে আমি। কি দরকার আমায় বলে যেতে পার। এস না বাবা, ভেতরে এস।

লোকটি দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—তিনি এলেই আসব বরং আমি, দেনাপাওনার ব্যাপার।

একটু হাসিয়া মা বলিলেন—দেনাপাওনার ব্যাপার হলে আমিই জানব ভাল। সে তো বাইরে বাইরে ফেরে, সে এসব জানেও না। কিসের দেনাপাওনা, কার সঙ্গে দেনাপাওনা?

—আজ্ঞে একখানা তমসুক আছে। বারো বছর হতে চলল উশুলের পর। তামাদী হবে, তাই বাবু পাঠালেন।

—কে? মহেন্দ্রবাবু? কিন্তু তার কাছে তো ঋণ আমরা কখনও করি নি।

মাথা চুলকাইয়া কর্মচারীটি জবাব দিল, আজ্ঞে দলিলখানা হচ্ছে এককড়ি গাঙ্গুলীর। সে বাবুকে দলিলখানা বিক্রি করেছে। প্রায় পাঁচশো টাকা বাকি দাঁড়াচ্ছে।

এই সময়ে এদিকের দরজা দিয়া সঞ্জীব প্রবেশ করিয়া কহিল—বেশ যা হোক তুমি, মা। সমস্ত ঠাকুরবাড়ি খুঁজে খুঁজে আমি হায়রান। বাবুর কর্মচারীটিকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—কি ব্যাপার মা? আপনি যে এ সময়ে ঘোষ মশায়?

ঘোষ মশায় বলিল—বাবু পাঠালেন আপনার কাছে। এককড়ি গাঙ্গুলীর একখানা বন্ধকী দলিল তিনি কিনেছেন। সেখানা তামাদীর মুখে। তাই খবর দিয়ে পাঠালেন

তিনি। আপনার বাবার সম্পাদন করা তমস্থক, আপনি জানেন বোধ হয়।

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সঞ্জীব উত্তর করিল—বাবা সে ঋণ শোধ করেছেন বলেই আমাদের ধারণা। তবে যদি সত্যিই পাওনা থাকে তবে নিশ্চয় শোধ দেব আমি। বাবার ঋণ কখনও রাখব না।

বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—তুই চুপ কর সঞ্জীব। শোন গো বাছা, তোমার বাবুকে গিয়ে বলবে সে দলিলের টাকা সঞ্জীবের বাপ শোধ দিয়ে গেছেন। পঁচিশ টাকা বোধ হয় বাকি ছিল কিন্তু সে টাকা রফা পাওয়ার কথা ছিল। গাঙ্গুলী আজ-কাল করে দলিলখানা ফেরত দেয় নি। ও টাকা আমাদের দেয় নয়—আমরা দেব না।

বাবুর কর্মচারী ঘোষ মশায় বিজ্ঞ হাস্যের সহিত বলিল—কিন্তু মা, দলিলে যখন বাকি রয়েছে, দলিলও যখন ফেরত হয় নি, তখন আদালতে গেলে যে আদায় হবেই, তখন আদালত খরচাও যে লাগবে।

মা এবার তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার সহিত বলিলেন—তাই দেব। পঁচিশ টাকার বাকিতে যদি পাঁচশো টাকা দিতেই রাজার হুকুম হয় তাও দেব। কিন্তু সে মীমাংসা না হলে এক পয়সাও দেব না। বল গিয়ে তোমার বাবুকে।

কর্মচারীটি সঞ্জীবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সঞ্জীববাবু!

মা উত্তর দিলেন। বলিলেন—ও আর নতুন উত্তর কি দেবে বাবা? আমি থাকতে ও কে? ওই ওর উত্তর। এই কথাই তোমাদের বাবুকে গিয়ে জানাও তুমি।

লোকটি তবুও সঞ্জীবকে প্রশ্ন করিল—এই জবাবই কি ঠিক সঞ্জীববাবু? একটা আপোস করলে হত না?

মা বলিয়া উঠিলেন—দেখ বাবা, আজ বিজয়া-দশমীর দিন, আজ কাউকে রুক্ষ কথা বলতেও নেই—কারও কাছ থেকে শুনতেও নাই। যাও তুমি বাবা, যা বললাম তাই গিয়ে তুমি বল।

জমিদারের কর্মচারী আর বাস্তুঘুঘুতে বড় বেশী নাকি তফাত নাই। বাস্তুঘুঘু তাড়াইলেও যায় না, একটু সরিয়া গিয়া আবার গলা ফুলাইয়া ফুলাইয়া ডাকে। ঘোষ মশায় এতটুকু বলাতে দমিবার পাত্র নয়, বেশ একটু মোলায়েম করিয়া সে বলিল, বললেই তো হয়ে গেল মা, হাতের তীর বেরিয়ে গেল। ঝগড়া বিবাদ বাধানো সোজা মা, মেটানোই কঠিন। তার চেয়ে একটা আপোস, সঞ্জীববাবু একবার গেলেই—

মা বলিলেন—জানি, কিন্তু সঞ্জীব যাবে না। তুমি যাও।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বাড়িটা ব্যাপ্ত করিয়া যেন রন্ রন্ শব্দে বাজিতেছিল। ঘোষ মশায় আর অপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। ছোট একটা নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া মা বলিলেন—আয় খেয়ে নে সঞ্জীব। বিজয়ার সময় আর বেশী নেই।

আসনের উপর বসিয়া সঞ্জীব বলিল—একটা কথা ভেবে দেখবার আছে মা। তুমি ভেবে দেখো। মহেন্দ্রবাবুকে মোকদ্দমায় হারিয়ে জিততে পারা যাবে না। আপীলের পর আপীল করে আমাদের তিনি ধ্বংস করবেন। এটা হল ওঁর একটা অস্ত্র। এই করেই বহু লোকের সর্বনাশ তিনি করেছেন। অথচ মাথা উঁচু করে চলেন। উনি হারেন কোন্‌খানে জান মা—যেখানে লোক ওঁর মিথ্যে-অন্যায় দাবী জেনেও টাকা ফেলে দিয়ে আসে সেখানে। সেখানে উনি মাথা হেঁট করে টাকা কুড়িয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করেই থাকেন—আর মাথা তুলতে পারেন না।

দৃঢ়স্বরে মা বলিলেন- না।

সঞ্জীব বলিল—তা ছাড়া পঁচিশ টাকা তো বাকি ছিল। রফার কথা সত্যি কিনা কে বলবে? বাবাকে ঋণী করে রাখা—

বাধা দিয়া মা কহিলেন—তার পাপ তোকে স্পর্শ করবে না সঞ্জীব—সে পাপ আমার।

সঞ্জীব আর কোন কথা কহিল না। নিশ্চিন্ত হইয়া নীরবে সে আহার করিতে বসিল।

কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন—নলিনীকে তুই কলকাতায় রেখে আয়। আমাদের যা হয় হবে—কিন্তু আশ্রয় যখন দিয়েছি—তখন বিপদের আঁচ যেন ওদের গায়ে না লাগে।

পরদিন সঞ্জীব নলিনী ও রমাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেল।

রমার সম্পর্কে কি করা হইবে বহুক্ষণ চিন্তার পর নলিনী বলিয়াছিল—রমাকে আমি নিয়ে যাই সঞ্জীববাবু। ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি নার্স করে তুলতে পারি তাহলে ওর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সঞ্জীব উল্লসিত আগ্রহে বলিয়াছিল—এই, এই কথাটাই যেন আবিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম মিস গাঙ্গুলী। তাই হোক—এর চেয়ে ভাল কিছু ওর পক্ষে হতে পারে না।

ট্রেনে চড়িয়া সঞ্জীব ও নলিনী তর্ক-বিতর্কে কামরাখানা যেন মাতাইয়া তুলিল। সুবিধাও হইয়াছিল বেশ—তাহারা তিনটি প্রাণী ব্যতীত অপর কেহ সে গাড়িতে ছিল না। রমা এক কোণে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে উল্কাবেগে। সম্মুখ হইতে গ্রামের পর গ্রাম ছুটিয়া আসে আবার পিছনে পড়িয়া যায়। প্রতি গ্রামখানিকেই রমার মনে হয় ওই আমাদের গ্রাম। ক্রমশঃ দেশের রূপ পরিবর্তিত হইতেছিল। এবার গ্রামগুলি আরও নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন—মৃত্তিকার রঙ কালো। সে গেরুয়া মাটির দেশ আর নাই।

এদিকে সঞ্জীব তখন বলিতেছিল—আর নয় মিস গাঙ্গুলী, বর্ধমান এগিয়ে আসছে। চিৎকার করে ক্ষিধেকে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। এতেই পকেট অনেক খালি হয়ে যাবে।

নলিনী বলিল—যে আপনার খাওয়া! পাখিতেও বোধ হয় আপনার চাইতে বেশী খায়।

সঞ্জীব হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—হয়েছে। খাওয়া নিয়ে বাড়িতে দিবারাত্রি মায়ের গার্জেনীর ঠেলায় অস্থির। গাড়িতেও শেষকালে বান্ধবী গার্জেন হয়ে উঠলেন। আমার অদৃষ্ট!

নলিনীও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—না, আপনাকে পারবার জো নেই। সকল কথাকেই আপনি হাসির ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

উচ্চ হাসির শব্দে রমা জানালা হইতে মুখ ফিরাইয়া এদিকে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া আবার জানালার বাহিরে ঝুঁকিয়া পড়িল।

সঞ্জীব বলিল—না না, এমন করে বাইরে ঝুঁকে থেকো না রমা। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে। হয়তো লাইনের পাশের গাছপালার ডালে আঘাতও লাগতে পারে।

রমা একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, কিন্তু মুখ ফিরাইল না। মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে কি যে বলিল তাও বেশ বোঝা গেল না।

নলিনী তাহাকে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিল—দেশের জন্যে মন কেমন করছে রমা?

মৃদু হাসিয়া রমা বলিল—না।

—তবে, তবে এমন করে রয়েছ যে?

অতি মৃদুস্বরে রমা বলিল—তোমরা কথা কইছ—। আর সে বলিতে পারিল না।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কি?

নলিনীর মুখখানাও রাঙা হইয়া উঠিল, সেও কথার কোন জবাব দিল না।

বিজয়া-দশমীর পরদিন কাছারীতে বসিয়া মহেন্দ্রবাবু পরামর্শ করিতেছিলেন সদরনায়েবের সঙ্গে। একটি জাল রচনার প্রণালী ও কৌশলই ছিল আলোচ্য বিষয়।

বাবু বলিলেন—দেখ, ওকে টাকা দিলে জলে পড়বে বলে আমার মনে হয় না। সে হ্যাণ্ডনোটেই হোক আর মর্টগেজেই হোক। প্রথমেই মর্টগেজে নিতে চাইলে ও এগুবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া বলিলেন—মানী লোক তো। মানের ভয়টা এ জগতের লোকের সব চেয়ে বেশী।

নায়েব চুপ করিয়া রহিল।

বাবুই বলিতেছিলেন—এই সব ইডিয়েটদের কথা মনে হলে আমার হাসি পায় হরিচরণ। ধর্ম দেখায় এরা। আত্মানং সততং রক্ষেৎ—এই কথাটাই হল বাস্তব জগতের সব চেয়ে বড় ধর্মের কথা অথচ এটাকেই করে ওরা অবহেলা।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার বলিলেন—আমায় এরা বলে অধার্মিক পাপী, অথচ আমার ঐশ্বর্য সম্পদের ঈর্ষা করতে ছাড়ে না। আঙুর ফল টক গল্পটা খুব ঠিক, যাক, এক কাজ কর তুমি, কোনও থার্ড পার্টিকে দিয়ে ওর কাছে প্রস্তাব করে পাঠাও যে টাকা হ্যাণ্ডনোটেই দেওয়া হবে। সে-ই যেন অনুরোধ উপরোধ করে এটা করে দিচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোক

হওয়া চাই। ওই সব লোকের মত ইডিয়ট ধর্মপরায়ণ গর্দভ হলে সব মাটি হবে।

নায়েব এতক্ষণে কথা কহিল। সে অতি মৃদুভাষী লোক। শ্রোতার যে কানটি তাহার দিকে থাকে সেই ভিন্ন অন্য কানে তাহার কথা যায় না।

সে বলিল—এতগুলো টাকা, একটু ভেবে দেখা উচিত। হ্যাণ্ডনোটে টাকা দেবেন, কিন্তু কাল যদি সে সম্পত্তি হস্তান্তর করে কি বেনামী করে ফেলে!

পেন্সিলের প্রান্তদেশটি ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু নীরব হইয়া রহিলেন। কপালের রেখাগুলি কুঁচকাইয়া চিন্তারেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে তিনি বলিলেন, না। তারপর বলিলেন স্পষ্ট ভাষায়, এ বুদ্ধি ওর হবে না। বললাম তো ও একটা গর্দভ।

মৃদু হাসিয়া নায়েব বলিল—একালে বুদ্ধি দেবার তো লোকের অভাব নেই। বুদ্ধি অপরে দেবে।

হাসিয়া বাবু বলিলেন—তুমি ছেলেমানুষ। বাস্তব সংসারের অভিজ্ঞতা এখনও হয় নি তোমার। আইনের কূটকৌশল যত কিছু, সবই তো আইনের বইয়েই আছে। সে-সব বই সব উকিলই পড়ে কিন্তু সবাই রাসবিহারী ঘোষ হয় না কেন? বুদ্ধি দিলেও সে নেবার ক্ষমতা ওর নেই।

নায়েব চুপ করিয়াই রহিল। স্বল্পভাষী লোক। তর্ক ভালবাসে না।

বাবু বলিলেন—এসব বুদ্ধি ওর কানে ঢুকবে কিন্তু মাথায় যাবে না। মন সায় দেবে না। বললাম তো ধর্মভীরু মানী লোক ওরা, প্রথমে ভাববেন ধর্ম, তারপর ভাববেন সুনামের কথা, তারপর হবে ভয়, কি জানি ফন্দী যদি না টেঁকে!

নায়েবের এসব মন্তব্য তবুও বেশ মনোমত হইল বলিয়া বোধ হইল না, কুণ্ঠিত ভাবেই সে বলিল—দেখুন যা আপনার ইচ্ছা হয়।

বাবু বলিলেন, পাশার ঘুঁটি আড়ি না দিয়ে গেলে উপায় নাই। আড়ি দিয়েও মার খায়, আক্ষেপ করে না। কিন্তু পার হয়ে গেলে ষোল আনাই লাভ। দাও ওকে, হ্যাণ্ডনোটেই ওকে টাকা দাও। এক বছর পরে তুমি মর্টগেজ আমার কাছে করে নিয়ো।

তারপর আবার ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া বলিলেন—লোক চেনার ক্ষমতা তোমাদের হয় নি এখনও। ওরা সব বড় মজার লোক। মরাল অব্লিগেশনের দড়ি একবার পরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। সে দড়ি ওরা কখনও ছিঁড়বে না, ছিঁড়তে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না, ভাববে লোহার শিকল। হাঁসের মত, জান তো হাঁসের ঘরে দড়ি ফেলে দিলে হাঁসগুলো ভয়েই মরে যায়, দড়িটাকে সাপ ভেবে।

নায়েব এবার বলিল—তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

—হ্যাঁ। মৌজা বনমালীপুর আমার চাই। ঘর থেকে বেরিয়েই পরের সীমানায় পা দিতে হয়। আর লাভও, মৌজাটাও ভাল। যে কোন উপায়ে—কে? কি বলছ তুমি?

সঞ্জীবের উত্তর-বাহক ঘোষ মশায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে প্রণাম করিয়া বলিল—

আজ্ঞে সঞ্জীব মুখুজ্যের ওখানে গিয়েছিলাম আমি। সে বললে—

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাবু বলিলেন—পরে শুনব। এর চেয়ে ওটা জরুরী বিষয় নয়। যাও, ওঘরে আপনার জায়গায় গিয়ে বসে কাজ কর এখন।

ঘোষ মশায় চলিয়া গেল।

নায়েবের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া ঘোষ মশায়কে ডাকিলেন। বলিলেন—কি বললে সঞ্জীব? জ্ঞান হয়েছে একটু?

সঞ্জীব ও তাহার মায়ের কথাগুলি অলংকার দিয়া বর্ণনা করিয়া ঘোষ মশায় বলিল—আজ্ঞে ছেলের চেয়ে দেখলাম মায়ের তেজই বেশী।

মহেন্দ্রবাবু গুম হইয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—আচ্ছা যাও তুমি।

নায়েবকে বলিলেন—সঞ্জীবের নামে একটা আর্জি করে দাও।

নায়েব বলিল—ওর মা যা বলেছে সেটা একবার ভেবে দেখবার কথা। শেষ পর্যন্ত এতে ঠকতে হবে হুজুর।

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বাবু বলিলেন—হাইকোর্ট পর্যন্ত আপীল লড়তে সঞ্জীবের খড়ের চাল বিক্রি হবে না?

—তার চেয়ে একটা ক্রিমিনাল কেস করলেই বোধ হয় ঠিক হবে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে মহেন্দ্রবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিলেন।

এবার অতি মৃদু স্বরে কয়টি কথা তাঁহাকে বলিয়া নায়েব সহজ স্বরে বলিল—ওর বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সবাই আমাদের পক্ষে রয়েছে। মেয়েটা হাতে আসে ভালই, নইলে ওকে মাইনর বলে চালিয়ে দিতে হবে। এ সেকসনে আর পার নাই। পাঁচ-ছ বছর নির্ঘাত।

বাবু আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে বলিয়া গেলেন, কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে একটা লোক পাঠিয়ে দাও।

মনের উচ্ছ্বাসের বাহ্যিক প্রকাশকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। খাস বৈঠকখানায় বসিয়া ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড খুলিয়া তাহার নীরস ধারাগুলির নাগপাশে বাঁধিয়া মনের উচ্ছ্বাসটুকু নিথর করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় সঞ্জীবকে পনের-ষোল দিন অপেক্ষা করিতে হইল। একটা মধ্যশ্রেণীর হোটেলে উঠিয়া নলিনীর জন্ত একটা বাসার সন্ধান করিতেই প্রথম আট-দশ দিন কাটিয়া গেল। বাসা তখনও ঠিক হয় নাই। সেদিন তখন কথা হইতেছিল বাসা লইয়াই।

নলিনী বলিল—বড় রাস্তার ওপরে হলেই ভাল হয়। প্রথম প্র্যাকটিসের মুখে আগে প্রয়োজন ডাক্তারের অস্তিত্বটা লোককে জানানো। খান-দুই ঘর, রান্নাঘর, কলঘর, বাথরুম এই হলেই যথেষ্ট আমার পক্ষে। বাসার খরচ চালানো তো বড় সোজা কথা হবে না। একটু

হাসিয়া নলিনী আবার বলিল—আর চাকরি নয় সঞ্জীববাবু। কষ্ট অবশ্য কিছু হবে। কিন্তু পুরুষের তাঁবেদারী করার চেয়ে সে কষ্ট অনেক সহনীয়।

সঞ্জীব বলিল—চাকরি করলেই যে পুরুষের তাঁবেদারী করতে হবে, এর কোন মানে নেই মিস গাঙ্গুলী।

তেমনি হাসিয়া নলিনী বলিল—আছে বৈকি সঞ্জীববাবু। সমস্ত পৃথিবীটারই যে এখনও ষোল আনার মালিক আপনারা। স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে যে দেশ যতই চিৎকার করুক, সকল দেশেই স্ত্রী-স্বাধীনতা আসলে একটি শূন্যগর্ভ পাত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে দেখাবার জন্য মঙ্গল-কলসের মত শৌখীন পাত্রই একটা তৈরী হয়েছে, কিন্তু অন্তঃসার-শূন্য। তাই চিৎকারটাও খুব প্রবল আর উচ্চ। আমাদের দেশের কথা ছেড়েই দিন—সব দেশেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হল পুরুষ। অবশ্য এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। কারণ তারা স্ত্রীলোকের চেয়ে বলশালী।

সঞ্জীব বলিল—বলপ্রয়োগ করাটাই যে নীতিবিগর্হিত হয়ে উঠছে দিন দিন, মিস গাঙ্গুলী।

হাসিয়া নলিনী বলিল—ও-কথার কোন অর্থ হয় না সঞ্জীববাবু। পৃথিবীতে যদি নীতি প্রচার হয় যে লোভের মূল হল দৃষ্টি, অতএব সবাই চোখ বন্ধ করে থাক, সেটা যেমন অসম্ভব এটাও ঠিক তাই। দৃষ্টিশক্তি থাকতে অন্ধ হওয়ার কল্পনা যেমন হাস্যকর, বল থাকতে সে বলপ্রয়োগ করবে না, এ কল্পনাও ঠিক তাই। না, চাকরি আর নয়। আমাদের দেশে প্রভুর সেবা করতে হয় আবার সর্বভাবে।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আপনি যে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিলেন। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষদের সঙ্গে যদি নারীর কখনও যুদ্ধ হয়, তবে আপনিই বোধ হয় হবেন বিদ্রোহের ধ্বজা-বাহিনী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল, কি যেন সে ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গাঢ়স্বরে ধীরে ধীরে বলিল—পুরুষ জাতটাকে আমি ঘৃণা করি না সঞ্জীববাবু। তাকে প্রভু বলে নারীকে মানতেই হবে। তাকে মানতে চাই আমি পিতারূপে—স্বামীরূপে, পরিণত বয়সে সন্তান-রূপে। প্রতিপালক প্রভুরূপে তাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—ভয় করি। বন্ধুরূপেও তাকে আমি পেতে চাই না। বন্ধুত্বের আবরণের মধ্যেও পুরুষ নারীর অজ্ঞাত শত্রু।

সঞ্জীবের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল—মিস গাঙ্গুলী, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এ আলোচনা এখন থাক।

সেই গাঢ়স্বরে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অকম্পিত দৃষ্টি মেলিয়া নলিনী বলিয়া গেল—সাপের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্বের মত এ বন্ধুত্ব ভয়ানক। সাপও পোষ মানে না—মানা সম্ভব হয় না; কিন্তু কি করবে সে, তার বিষদাঁতের জন্য তো সে দায়ী নয়। বন্ধুত্বের বিনিময় করতে গিয়ে সে বিষদাঁত একদিন-না-একদিন মানুষের দেহে বিঁধে যায়। নারী-পুরুষেরও তাই, সঞ্জীববাবু। অসতর্ক মুহূর্তে ব্যবধান ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেই সে পুরুষের বন্ধুত্ব হয়ে দাঁড়ায় উন্মত্ত মোহ। নারীরও বুকে বিষ আছে, কিন্তু সে বিষ নীলকণ্ঠের মত গোপন করে রাখে তারা। মোহে

নারীর উন্মত্ততা আসে না, সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। নলিনীর রূঢ় বাক্যে সে আঘাত পাইলেও অপরাধ গ্রহণ করে নাই। নির্যাতিতা মেয়েটির বুকের অসহনীয় বেদনার জন্য তার করুণার আর অন্ত ছিল না। ঘরের মধ্যে নলিনী একাই বসিয়া রহিল। নির্জনতার অবকাশের মধ্যে আছে একটি উচ্ছ্বাস প্রকাশের মোহ।

নলিনীর ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আয়ত চোখ দুইটির কূল ভরিয়া অশ্রু টলমল করিতেছিল।

রমা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশভূষায় একটি বিশেষত্ব ছিল। মাথার এলানো চুলগুলি রুক্ষ ধূসর সৌন্দর্যে মেঘের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেহের তৈলমসৃণ সুগৌর বর্ণ মসৃণতাহীন উগ্রতায় ঈষৎ রক্তিম।

নলিনী তখনও আপনার কথাটা ভাবিতেছিল। সে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।

রমাই সলজ্জভাবে হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চুলে বড় আঠা ধরেছিল, তাই সাবান দিলাম আজ। কিন্তু মুখ-হাত যে বড় জ্বলছে দিদিমণি।

কোলের আঁচলে চোখের জলের লজ্জাটুকু মুছিয়া লইয়া সে বলিল—ওই দেখ টেবিলের ওপর স্নো রয়েছে, একটু মেখে ফেল। দেখেছিস বোধ হয় আমি মুখে মাখি, হ্যাঁ, ওইটে।

ঘণ্টা-দুয়েক পরে সঞ্জীব আসিয়া বলিল—একটা সুসংবাদ আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিল—আপনি মঙ্গলের অগ্রদূত, সঞ্জীববাবু। মঙ্গল আপনার অনুসরণ করে, আর আপনাকে লঙ্ঘন করে যেতে হয় রাজ্যের অমঙ্গল।

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আজ এত বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন কেন বলুন তো? রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদে' পড়েছিলাম অ্যাসিডিটি বেশী হলে এই রকম লক্ষণ দেখা দেয়। ওষুধও তিনি বাতলেছেন, বাইকার্বোনেট অফ সোডা। তাই বরং একটু খেয়ে দেখুন।

হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিল—মহাকবির চরণে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন জানাচ্ছি। কিন্তু তাঁর প্রেসক্রিপসন মত ওষুধ আমি খেতে পারব না। উচ্ছ্বাস আসে বৈকি সঞ্জীববাবু। সত্য যে সুন্দর, সুন্দরই আনে মোহ, আর মুগ্ধ অন্তরই হল উচ্ছ্বাসের উৎপত্তিস্থল। মিথ্যা তো বলি নি আমি, অসীম পৃথিবীর জন্য বিরাট মঙ্গল আপনি আনতে পারেন না, সে শক্তি আপনার নাই। সমগ্র দেশও তো আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দু-দশটি মানুষের মঙ্গল সেও তো সংসারে দুর্লভ, সেই বা ক'জনে—

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—শুনুন শুনুন, আমার সংবাদটা শুনুন আগে। একটি ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কথায় কথায় তিনি বললেন, তাঁরা কজন বন্ধু মিলে একটা ডাক্তারখানা খুলেছেন। অনেকটা ডক্টর্স্ য়্যুরো গোছের ব্যাপার। আসল উদ্দেশ্য হল পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁরা লেডি ডাক্তারের সাহায্যও নেবেন। আমি আপনার নাম করলাম। কিন্তু আপনার মত না নিয়ে কথা দিতে পারলাম না।

নলিনী বলিল—কি বলে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, আমি যে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার ভবিষ্যতের চিন্তার অর্ধেক ভার লাঘব করে দিলেন।

সঞ্জীব তেমনি লঘুভাবে বলিল—এখন একটা বাসা ঠিক করতে পারলেই, ব্যস, আমি খালাস। কি বলেন?

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—হ্যাঁ। সে উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিল।

সঞ্জীব বলিল—ব্যাঙ্কে যাবেন বলছিলেন না?

—হ্যাঁ যাব একবার। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে আমার। পাসবইখানা আছে, চেক-বই নাই। চেক-বই একখানা নিয়ে আসব। আর টাকাও কিছু বার করতে হবে।

—বেশ, আপনি তৈরি হয়ে নিন তাহলে।

—আপনার পাওনার হিসেব একটা তৈরি করে দেবেন দয়া করে। কত টাকা হবে জানালে টাকাটা আনার সুবিধা হত।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না মিস গাঙ্গুলী। এখন সে শোধ করবার দরকার নেই। সঞ্চয় যেটা আছে সে নষ্ট কববেন না। উপার্জন থেকে বরং ক্রমে ক্রমে শোধ করবেন।

মুখ ফিরাইয়া নলিনী বলিল—না। উপকারের ঋণ শোধ করবার অহঙ্কার আমার নেই সঞ্জীববাবু। আজীবন সে ঋণ আপনাদের কাছে আমার থাক। কিন্তু অর্থের ঋণ অতি হেয় জিনিস, সে আমি রাখতে চাই না।

এবার সঞ্জীব ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া পারিল না। তবুও সে নীরব রহিল।

ঘরের বন্ধ দরজাটা ঠেলিয়া নলিনী বলিল—কে? রমা? কি করছিলে তুমি এখানে?

বিবর্ণ মুখে রমা কি বলিল বেশ বুঝা গেল না। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দিবার মত অবসর বা মনের অবস্থা নলিনীর ছিল না। সে কাপড় বদলাইতে ওঘরে চলিয়া গেল। কাপড়চোপড় পাল্টাইয়া বাহির হইবার মুখে রমাকে সে বলিল—আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি। এ কি রমা, কাপড়ের নীচে সেমিজ পর নি, ছিঃ! সেমিজ পরে ফেল একটা। আর এ-ঘরে চাবি বন্ধ করে ও-ঘরে বসে থাক। সাবধানে থাকবে, বুঝলে? অন্য কোন ঘরে যাবে না।

রমা বলিল—আমার জন্য একটা স্নো আনবে দিদিমণি!

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে দেবতা বলে মানতে ইচ্ছা করে। যখন তিনি সুপ্রসন্ন দৃষ্টি দেন তখন কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না।

সামান্য কতক কতক আসবাবপত্র কিনিয়া বাসাখানিকে বাসোপযোগী করিয়া বাসায় আসিয়া ওঠা হইল।

সঞ্জীব বলিল—গৃহপ্রবেশের দিন আপনার আজ। বেশ ভাল করে রান্নাবান্না করুন। আমি হলাম ব্রাহ্মণ, ভোজন করে দক্ষিণা নিয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় হব।

নতমুখে নলিনী বলিল—আমার হাতে ভাত খাবেন আপনি ?

তাহার মুখের উপর অকুণ্ঠিত পরিপূর্ণ দৃষ্টিখানি নিবদ্ধ করিয়া সঞ্জীব অভ্যাসমত হাসিয়াই উত্তর দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর হাস্যস্পর্শে লঘু নয়, গভীর আন্তরিকতায় মর্ম স্পর্শ করে সে স্বর। সে বলিল—আমরা কমরেড, মিস গাঙ্গুলী। আপনি আমার চেয়ে হীন নন, আমার চেয়ে অস্পৃশ্যা নন, পৃথিবীর সুমতল বুকের উপর আমরা মানুষ।

উজ্জ্বল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সঞ্জীবের চোখে চোখ রাখিয়া নলিনী বলিল—অপরাধ যদি করি মার্জনা করবেন দয়া করে। আপনি কি বিপ্লববাদী ?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—না, আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ মিস গাঙ্গুলী। বিরাট দেশের দৈন্য-দুর্দশা দেখবার মত দৃষ্টি আমার নাই। আমি আমার পল্লীটুকুর মধ্যে কাজ করি। আর করি যারা চারদিক থেকে সমাজের সকল স্তরের চাপে পিষ্ট। পল্লীতে আমি নতুন রূপ দিতে চাই। তাতে যদি ভেঙে যায় পুরাতন, যাক ভেঙে। ভেদাভেদহীন মানুষের একটি বসতি—শ্রীময়ী শক্তিময়ী শান্তিময়ী পল্লী আমি গড়ে তুলব।

নলিনী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। কথা শেষ হইবার পরও সে কথা কহিতে পারিল না।

সঞ্জীবই আবার বলিল—প্রয়োজন হলে সাহায্যের প্রার্থনা করব মিস গাঙ্গুলী। আমার বিশ্বাস আপনার সাহায্য পাব।

নলিনী গাঢ় স্বরেই বলিল—আমার জীবন কৃতার্থ হবে সেদিন, সঞ্জীববাবু।

হাত বাড়াইয়া সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—হাতে হাত দিন, আমরা কমরেড।

নিঃসঙ্কোচে হাতে হাত দিয়া নলিনী বলিল—কমরেডের জন্যে কি রান্না করব বলুন! কমরেড কি খেতে ভলেবাসেন ?

সঞ্জীব বলিল—ভাল রান্না হলে সবই আমার ভাল লাগে। তবে পাতের প্রথম দিকে যেগুলো থাকে সেইগুলোর ওপর আমার লোভ বেশী। কারণ শেষের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পেট আসে ভরে। তখন সেগুলো আর ভাল লাগে না।

নলিনী হাসিয়া উঠিয়া গেল। পাশের ঘরটার দরজা ঠেলিয়া সে ডাকিল—রমা!

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া রমা কি করিতেছিল, নলিনীর কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

নলিনী দেখিল, সে তাহার কেশ প্রসাধনের সামগ্রীগুলি লইয়া আধুনিক রুচি অনুযায়ী কেশবিন্যাসের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নলিনীর কিন্তু আজ রাগ হইল না। তাহার মন ছিল তুষ্ট, সে স্নেহসিক্ত স্বরেই বলিল—ও-বেলা ভাল করে চুল বেঁধে দেব তোমার। এখন এস তো ভাই, রান্নার বাটনাগুলো বেটে দেবে এস তো।

ঘণ্টাখানেক পরে সেদিন অপরাহ্ণে সঞ্জীব বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। রমা বলিলেন—

আজ আবার ধোওয়া কাপড় ভাঙলি যে সঞ্জীব? যে কাপড় পরছিলি সে তো তেমন ময়লা হয় নি!

সঞ্জীব বলিল—নিচের দিকটা রাঙা ধুলোয় লাল হয়ে গেছে মা। তা ছাড়া কাল সকালেই একবার কলকাতা যাব, তাই—

কথা শেষ না হইতেই মা বলিয়া উঠিলেন—এখন কলকাতা কি জন্যে আবার?

ছেলে হাসিয়া বলিল—কোথাও যাব বললেই তোমার মাথা ধরে! না মা?

স্থির দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—কাজটাই কি শুনি?

—আমাদের কো-অপারেটিভ স্টোরের জিনিসপত্র আনতে হবে মা।

মা বলিলেন—এতদিন তো এই সদর শহর থেকেই জিনিসপত্র আসছিল। এখন আর কলকাতা না হলে চলছে না?

ছেলে কহিল—তখন আমাদের পুঁজি ছিল কম, জিনিসপত্রও আসত কম। কলকাতা আসা-যাওয়ার খরচ পোষাত না। এখন আমাদের আয় বেড়েছে। কলকাতা গেলেই এখন সুবিধে হবে।

মা প্রশ্ন করিলেন—কবে ফিরবি?

—পাঁচ-সাত দিনের বেশী হবে না বোধহয়।

—উঠবি কোথায়?

—কোন বন্ধুর বাড়ি, কিম্বা কোন মেসে উঠব। ঠিক করি নি কিছু।

মা বলিলেন—অ।

তারপর ওঘরে যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মা বলিয়া উঠিলেন—চুলগুলো আজকাল কি ফ্যাশনে কাটাচ্ছিস রে? একেবারে ঘাড়ের চামড়া বের করে—ছিঃ!

ঘাড়ে হাত বুলাইয়া হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—আচ্ছা, সামনের দিকটা খানিকটা কেটে ফেলব কলকাতায়।

মা বলিলেন—চার আনা পয়সা দিয়ে? তুই আজকাল বড় বাবু হয়ে উঠেছিস সঞ্জীব।

হাসিয়াই সঞ্জীব বলিল—চার পয়সাতেও চুল কাটা হয় মা সেখানে।

গম্ভীর ভাবে মা বলিলেন—চার পয়সা কিম্বা চার আনার জন্যই শুধু বলি নি আমি। সত্যিই তুই আজকাল বাবু হয়ে উঠেছিস। এ ভাল নয়।

আশ্চর্য হইয়া সঞ্জীব বলিল—বাবুগিরি তো কিছু করি নি মা। নিজেই নিজের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ পর পুনরায় বলিল—সত্যিই কি আমি বাবু হয়ে পড়েছি মা? কিন্তু তুমিই তো আমায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য তিরস্কার করতে।

ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর বিলাসিতায় পার্থক্য আছে বাবা। তারপর সস্নেহে আবার বলিলেন—ছেলেকে মা মানুষ করে তোলে কারিগরের হাতের পুতুলের মত। সে পুতুল যদি মনের মত না হয় সঞ্জীব, তবে আর আক্ষেপের সীমা থাকে না বাবা। মায়ের মনে হয় এর চেয়ে আমার মৃত্যু হল না কেন?

সঞ্জীব নীরবেই সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ পর সে ডাকিল—মা!

মা আর সেখানে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। ঘরের মধ্যে তিনি আপনার কাজ করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতেই উত্তর দিলেন—কিছু বলছিস আমায়?

ঘরের দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঞ্জীব বলিল—আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি মা?

সস্নেহ হাস্যে মায়ের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তুই আমার পাগল ছেলে রে! মা কি ছেলেকে উপদেশ দেয় না?

রাত্রে সঞ্জীব খাইতে বসিলে মা বলিলেন—মহেন্দ্রবাবু নালিশ করেছেন। বিকেলবেলা তুই বেড়াতে গেলে সমন জারী করে গেল।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—মামলা-মোকদ্দমার কিছুই জানি নে আমি মা। তুমিই এই ঝঞ্ঝাট টেনে আনলে, এ পোয়ানো আমার পক্ষে ভারী কঠিন হবে।

মা উত্তর দিলেন কঠিন স্বরে—তা তো হবেই বাবা! এতে তো আর দেশোদ্ধার হবে না!

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। মা বলিলেন—বেশ, আমিই যাব আদালতে। তোমার সংসারে এসে সুখ তো হল আমার ষোল আনা। এটুকুই বা বাকি থাকে কেন? এও হবে।

সঞ্জীব বলিল—সে তো আমি বলি নি মা। আমি বলছি—আইনকানুন সম্বন্ধে কিছুই আমি জানি না।

রুষ্টভাবে মা বলিলেন—তুই মানুষ না জানোয়ার? মোকদ্দমার কিছুই জানি না বলে হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! সবই কি লোকে মায়ের পেট থেকে শিখে আসে? কলকাতা যাবি তুই পরে। কালই তুই সদরে যা। সেখানে উকিল আছে, আইনের পরামর্শ দেবার জন্যই। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করতে হবে করে আয়।

সঞ্জীব বলিল—বাঃ রে! তুমি বলে না দিলে পথই বা আমি জানব কি করে?

অত্যন্ত কঠোর ভাবে মা বলিয়া উঠিলেন—ন্যাকামি করিস না সঞ্জীব। সব আমি সইতে পারি, ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না। বাবা, আসলে এ ব্যবস্থাটাই তোমার মনঃপূত হয় নি। নইলে আইন না জানার জন্যে কিছু যেত আসত না। আইন না জানলেও শেখা যায়। কই বাবা, নলিনীর জামীন হবার সময় তো আইন না জানায় কিছু যায়-আসে নি। মায়ের পরামর্শের দরকারও হয় নি। সেদিন তো আইনের ধারা নিজেই জেনে নিয়েছিলে।

নতমুখে সঞ্জীব বলিল—তাই হবে মা, কালই সদরে যাব।

মা বলিলেন—এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সঞ্জীব। নিজের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতে পার, তবে পরের অধিকার রক্ষা করতে যাবে কোন্ সাহসে? আর আইন আদালত তো ছোট জিনিস নয় বাবা। যে কোন রাজ্যে বাস করতে গেলে সে রাজ্যের আইন যে না জানে তাকে বলি আমি মূর্খ।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে উকিলকে কি ভাবে কি বলতে হবে সে সব বলে দাও আমায়,

* *

আমি নোট করে নেব।

মা বলিলেন—রচনা করে শিখিয়ে দেবার তো কিছু নেই এতে। সত্য যা, উকিলকে তাই বলবে। সে-সবই তো জান তুমি। তবে মনোবিবাদ হেতুই যে মহেন্দ্রবাবু এ মোকদ্দমা করেছেন, সত্য হলেও এটুকু আমাদের না বলাই ভাল। তাতে তাঁর দুর্নাম রটবে, আর নলিনী-রমারও কলঙ্ক রটবে।

সঞ্জীব বলিল—সত্য যা ঘটেছে সেইগুলোই আমি লিখে নিতে চাচ্ছিলাম মা। যদি ভুলেই যাই কোনটা! লিখে নেওয়াটা ভাল।

—আচ্ছা, সেগুলো গুছিয়ে আমি লিখে দিচ্ছি। তুই তা হলে কাল এখানে ফিরে পরশু কলকাতায় যাবি।

—না মা। তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমি বরং ওই পথেই কলকাতায় চলে যাব। তোমায় চিঠিতে খবর দিয়ে যাব বরং।

হারান বাগ্দী এই সময় বাড়িতে প্রবেশ করিয়া মাকে প্রণাম করিয়া একটা হাঁড়ি নামাইয়া দিল। বলিল—খেজুরের গুড় আছে মা খানিকটে। দাদাবাবু বলেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যাবেন।

সঞ্জীব বলিল—নলিনীকে দিয়ে আসব মা।

মা প্রশ্ন করিলেন—নলিনীর ঠিকানাটা কি রে? ওখানে চিঠি দিলেই তুই পাবি বোধহয়?

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ মা, সেই ভাল হবে। দরকার হলে ওখানেই চিঠি দিয়ো তুমি। যেখানেই থাকি রোজ একবার খবর নেব নলিনীর বাসায়।

মহকুমায় উকিলের সাহায্যে মোকদ্দমার কাজকর্ম শেষ করিয়া সঞ্জীব কলকাতায় আসিয়া পৌঁছিল রাত্রে। উঠিয়াছিল সে ভবানীপুরে একটা মেসে। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া অভ্যাসমত সে বেড়াইতে বাহির হইল। শীত সবে পড়িতেছে। বিলাসিনীর সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বসনের মত ক্ষীণ কুয়াশায় শহরের সর্বাঙ্গ আবৃত। অভ্যাস ও নিয়মমত দ্রুতপদে সঞ্জীব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়া পূর্বমুখে বড় গির্জাটার নিকট চৌরঙ্গীতে আসিয়া উঠিল। ট্রাম, বাস তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। একখানা ট্রাম চলিতেছিল ধর্মতলার দিকে। রাস্তার জংশনের উপর ট্রামস্টপে ট্রামখানা বোধহয় সঞ্জীবকে দেখিয়াই থামিয়া গেল। অকস্মাৎ সঞ্জীব বিনা কারণে ট্রামখানায় উঠিয়া পড়িল। কণ্ডাক্টর আসিয়া টিকিটের জন্য দাঁড়াইতেই সঞ্জীবের সে কথাটা খেয়াল হইল। তাই তো, কোথায় যাইবে সে? পরক্ষণেই একটি সিকি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—শ্যামবাজার।

শ্যামবাজারে নলিনীর বাসায় আসিয়া ঘরের বাহির হইতেই সে বলিয়া উঠিল—সুপ্রভাত মিস গাঙ্গুলী।

দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল রমা। আড়ম্বরহীনা, একান্ত সঙ্কুচিতা সরলা পল্লীর সে মেয়েটি তো এ নয়। সযত্ন মার্জনায়, সুচারু প্রসাধনে শান্ত সৌন্দর্য তাহার উগ্র, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, দেহের বর্ণলাবণ্যে রক্তাভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তৈলহীন চুলগুলি রেশমের মত কোমল ও চিকণ। সূক্ষ্ম সরলরেখার মত সিঁথি টানিয়া হালফ্যাশনে সযত্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত। হাতে দুগাছা চুড়ি।

রমা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—দাদাবাবু। কণ্ঠস্বরের মধ্যে সুপরিস্ফুট লজ্জার পরিচয়।

সঞ্জীবের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। এই সেই রমা!

মুখ নত করিয়া রমা আবার বলিল—বসুন দাদাবাবু। দিদিমণি স্নান করছেন। আসবেন এক্ষুনি।

এতক্ষণে সঞ্জীব বলিল—তোমায় আমি চিনতেই পারি নি রমা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলে আর চিনবার উপায় নাই তোমাকে।

রমা মুখ নত করিয়াই রহিল। কিন্তু তাহার অনাবৃত মুখের যে অংশটুকু দেখা যাইতেছিল, সেইটুকুরই রক্তাভ বর্ণ হইয়া উঠিল সুরক্তিম।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃষ্টমনে সঞ্জীব বলিল—এদিকে তো দেখতে-শুনতে শহুরে হয়েছ। কিন্তু কাজে-কর্মে কতদূর এগুলো পরীক্ষা দাও দেখি। চায়ের জল চড়িয়ে দাও। চা তৈরি করতে শিখেছ?

হাসিমুখে রমা বলিল—চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি। চা তো এখন আমিই তৈরি করি।

—আর কি কি শিখলে বল! নার্সের কাজ শিখছ তো?

ঘাড় নাড়িয়া রমা বলিল—হ্যাঁ। থারমোমিটার দিতে পারি, দেখতে পারি। ফুটবাথ দিতে শিখেছি। মাথায় জলপটি দিতে পারি। এখন ফার্স্ট এড শিখছি, দাদাবাবু।

উৎসাহ প্রকাশ করিয়া সঞ্জীব বলিল—বাঃ, বাঃ! এ যে অনেক শিখে ফেলেছ দেখছি। তারপরে লিখতে পড়তে শেখাও যে দরকার। সেটা আরম্ভ করেছ?

রমা বলিল—দিদিমণির কাছে পড়ছি—প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। কালো জল, লাল ফুল পড়ছি এখন। ঐ যা—চায়ের জল পড়ে যাচ্ছে বোধহয়।

রান্নাঘরের দিক হইতে একটা সোঁ সোঁ শব্দ উঠিতেছিল।

রমা লঘুপদে বাহির হইয়া গেল। সে গতির মধ্যে তরঙ্গায়িত একটি ভঙ্গি আছে। সঞ্জীবের সেটুকু বড় ভাল লাগিল। পরম স্নেহভরে রমার গমনপথের দিকে সে চাহিয়া রহিল।

—নমস্কার! সদ্যস্নাতা নলিনী ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল।

সঞ্জীব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—শুধু নমস্কার নয়, সুপ্রভাত কমরেড।

অপরাজিতার ফুলটি যেন মৃদু বাতাসে দুলিয়া উঠিল। লাজনম্র মৃদু হিল্লোলে ঈষৎ চঞ্চল হইয়া শ্যামলা মেয়েটি হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—কমরেড! তারপর পাশের চেয়ারে বসিয়া সে বলিল—ভারী মন কেমন করে কিন্তু সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমাদের বুঝি করে না মনে করেন? সত্যি মিস গাঙ্গুলী, এখান থেকে বাড়ি গিয়ে বাড়িটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত। আপনি যখন ছিলেন তখন বাড়ির একটা নতুন শ্রী হয়েছিল। অভাবের মধ্যে প্রতিনিয়তই সেটা এখন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

নলিনী পিছন ফিরিয়া কি যেন একটা দেখিয়া লইল। তারপর বলিল—মা ভাল আছেন সঞ্জীববাবু? তিনি আমার নাম করেন?

সঞ্জীব বলিল—অসংখ্যবার। বলেন, মেয়ে কি বউ নইলে সংসার মানায় না। নলিনী থেকে সেটা আমি বেশ বুঝেছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার বিপদ। বলেন বিয়ে কর তুই। কি, ওটা কি কুড়োচ্ছেন আপনি?

নত হইয়া নলিনী কি একটা কুড়াইতে চেষ্টা করিতেছিল। সে বলিল—একটা পায়রার পালক। ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সে বলিল—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবেন তো আমাদের?

সঞ্জীব হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া সে বলিল—তপস্বী শিব আমাদের দেবতা, নলিনী দেবী। আমাদের দেবতার কোপানলে মদন হয়েছিল ছাই। প্রেমে আমাদের অধিকার নেই নলিনী দেবী। নিমন্ত্রণের আশা আপনার একান্ত দুরাশা বলেই মনে হয়।

নলিনী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সে ধীরভাবে বলিল—মদন ছাই হয়েছিল—কিন্তু অতনু অবিনাশী সঞ্জীববাবু। গৌরীর তপস্যা শিবের বরদান ইত্যাদি যত কৈফিয়তের দোহাই দিন আপনারা, অতনুর জয়-গৌরব তাতে ঢাকা পড়ে না। যাক ও-কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নারী জাতিকে এত তুচ্ছ মনে করেন কেন?

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—অবিচার করছেন আমার ওপর। নারী জাতিকে তুচ্ছ আমি মনে করি নে। না হলে আপনাকে কমরেড বলতাম না কখনও। নারী জাতিকে সহকর্মিণী বলে গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না, মিস গাঙ্গুলী। কিন্তু সহধর্মিণীরূপে কল্পনা করতে পারি না, তাতে আমার ভয় হয়। ভুজলতার বন্ধন শৃঙ্খলের চেয়ে কঠিন এবং দৃঢ়।

নলিনী এ কথার কোন উত্তর দিল না। নীরবে সে পালকটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রমা ঘরে চা লইয়া প্রবেশ করিল। পরিপাটি শৃঙ্খলার সহিত কাপ দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—ময়দা মেখে রেখেছি, লুচি ক'খানা ভেজে নিয়ে আসি। চলে যাবেন না দাদাবাবু।

চা পান করিতে করিতে নলিনী বলিল—ক'দিন ধরে আপনার কথাই ভাবছিলাম আমি।

আপনার পরামর্শ না নিয়ে কিছু স্থির করতে পারি নি সঞ্জীববাবু। রমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন আপনি?

সঞ্জীব কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিয়া সে নলিনীর মুখের দিকে চাহিল।

নলিনী বলিল—বাইরের মত বোধ করি ওর মনেও একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন ওর দায়িত্ব নিতে আমার ভয় হচ্ছে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—না না, না মিস গাঙ্গুলী। একান্ত সরল ও।

নলিনী বলিল—সরলের চেয়েও বেশী, রমা বুদ্ধিহীনা। সেখানেই বিপদের ভয় বেশী। আপনাদের চেয়ে ওদিকে আমাদের দৃষ্টি অনেক প্রখর। এতদিন ও ছিল শিশু। এখন কিন্তু ওর ভেতরে ক্রমে ক্রমে মনের বয়স বাড়ছে। হয়তো দেহের বয়সের সঙ্গে মনও ওর এতদিনে সমবয়সী হয়েই উঠল।

সঞ্জীব চিন্তান্বিত ভাবে বলিল—প্রতিকারের কি করা যায় বলুন তো?

নলিনী বলিল—প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা ছেড়ে দিয়েই আজ এ অবস্থা। বিধবা বিবাহ কি আপনি সমর্থন করেন সঞ্জীববাবু? সেই হবে এখন প্রকৃষ্ট উপায়।

সঞ্জীব আনন্দে বলিয়া উঠিল—সেই সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে ভাল মিস গাঙ্গুলী। এর চেয়ে ভাল সত্যি কিছু হতে পারে না। আহা-হা, এমন সুন্দর ফুলের মত মেয়েটি মা হয়ে সংসারে ধন্য হোক। ওর রূপের প্রতিবিম্ব পেয়ে পৃথিবীও সুন্দর হবে।

নলিনী কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অকস্মাৎ উঠিয়া চায়ের পেয়ালা দুটি লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—পেয়ালা দুটো ধুয়ে ফেলা দরকার।

সঞ্জীব বলিল—আমিও তাহলে উঠি।

নলিনী তখন ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সঞ্জীব একটু আহত হইল। সে অনুভব করিল, নলিনীর অন্তরের মধ্যে কোথায় আছে যেন চোখে না ঠেকার মত অতি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণধার একটি কাঁটা। ব্যবহারের মধ্যে সুতীক্ষ্ণভাবে পর পর যেন সেটা বিঁধিতে থাকে। ফিরিবার পথে বার বার সে এই কথাটাই চিন্তা করিল। সে স্থির করিল অপ্রয়োজনে সে আর নলিনীর ওখানে যাইবে না।

সেদিন সকালেই নলিনী একটা কলে বাহির হইয়াছিল। ফিরিতে হইয়া গেল বারোটারও বেশী। রমাও সঙ্গে গিয়াছিল, সে পিছনে পিছনে ওষুধ ও যন্ত্রপাতির বাক্সটা হাতে করিয়া আসিতেছিল। ঘরের দরজাটা খুলিয়া ঘরে ঢুকতেই নলিনীর নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি।

কাহাকেও না পাইলে পিয়ন দরজার ফাঁক দিয়া এমনিভাবে চিঠিপত্র ভিতরে ফেলিয়া দিয়া যায়। চিঠিখানি সে কুড়াইয়া লইল। দেখিল তাহাকেই কে লিখিয়াছে। হস্তাক্ষর

পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। চিঠিখানি ছিঁড়িয়া প্রথমেই সে দেখিল লেখকের নাম। সেখানে লেখা ছিল—আশীর্বাদিকা, শুভার্থিনী 'সঞ্জীবের মা'। চিঠিখানা সে রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া গেল।

"কল্যাণীয়াসু,

মা নলিনী, আমার অসংখ্য আশীর্বাদ জানিবে। আশা করি তুমি ও রমা কুশলেই আছ। তোমাকে আজ একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় জানাইতেই এই পত্র লিখিতেছি। তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি ভুল বুঝিবে না। তোমরা আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মেয়ে। কিন্তু মা, সংসারের অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী। মা, একটা বয়স আছে, যে বয়সে সম্বন্ধহীন স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা আমরা ভাল মনে করি না। এমন ক্ষেত্রে বিপদও অধিকাংশ স্থলেই হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি সঞ্জীব ও তোমার মধ্যে বন্ধুত্বের জের আর না চলাই ভাল। তাহাতে তোমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার ধারণা। আমার ছেলেকে আমি জানি। সে কখনও তাহার সচেতন বুদ্ধিতে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে না। কিন্তু মা, কোন তুচ্ছতম বস্তুই তো মানুষ জ্ঞাতসারে হারায় না। হারাইলে তাহাকে হারানো বলে না, বলে বিসর্জন দেওয়া। তাহা সে কখনও করিবে না। কিন্তু যদি অজ্ঞাতসারেই সে কোনদিন নিজেকে হারাইয়া ফেলে, তবে তাকে দোষ দিব কি করিয়া?

সঞ্জীবকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে যাওয়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা। আর আকর্ষণ যদি ইতিমধ্যে প্রবলই হইয়া থাকে তবে মায়ের অবাধ্য হওয়া বা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া যুবক পুত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়।

একদিন সে তোমার উপকার করিয়াছে। আজ তাহার প্রতিদান আমি দাবী করি। তুমি তাহার পথ হইতে সরিয়া যাও। তুমি নিজেও তোমাদের সমাজের মধ্যে বিবাহ করিয়া সুখী হও এই আমার উপদেশ। আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও। ইতি"

নলিনীর পায়ের তলায় বসুন্ধরা যেন দুলিতেছিল। বিবর্ণমুখে শূন্য দৃষ্টিতে সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখের সম্মুখে সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু একটি মুখ—অবশ্য অগণ্য অসংখ্য হইয়া সারি সারি সে ভাসিয়া চলিয়াছে। নিস্পন্দ দেহের মধ্যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল শুধু দুটি ঠোঁট, দুটি বায়ুতাড়িত বটপত্রের মত।

রমা লজ্জিত স্বরে ডাকিল—দিদিমণি!

সেই বিহ্বলতার মধ্যেই নলিনী উত্তর দিল—অ্যাঁ!

—কি হয়েছে দিদিমণি?

নলিনী উত্তর দিল না।

রমা আবার ডাকিল—দিদিমণি!

এবার নলিনী যেন সচকিত হইয়া উঠিল। কহিল—রমা! কিছু বলছ?

—কি হয়েছে দিদিমণি?

তখনও নলিনীর ঠোঁট দুইটা কাঁপিতেছিল। কোনরূপে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে উত্তর দিল—কিছু হয় নি রমা। তুমি রান্নাটা চড়িয়ে ফেল গিয়ে। আমার একটু কাজ আছে, সেরে ফেলি।

রমা চলিয়া গেলে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে যেন ভাঙিয়া পড়িল। তারপর সে যখন মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, তখন সম্মুখের দেওয়ালের আয়নায় দেখিল তাহার ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিচিত্র এক হাসি। পত্রখানার অতর্কিত আঘাতে নিজের ক্ষণিক বিমূঢ়তার জন্য বার বার তাহার প্রতিবিম্বখানি ব্যঙ্গ হাস্যের তীক্ষ্ণ সায়কে তাহাকে যেন জর্জর করিয়া তুলিতেছিল।

ধূমকেতুর বিরহে পৃথিবীর শোক। এই সম্পূর্ণ সজাগ মুহূর্তে সঞ্জীবের সহিত জীবন-সূত্রে গ্রন্থি দেওয়ার কল্পনা যে কতবড় হাস্যকর তাহা ক্ষণপূর্বের অশ্রুসজল চোখের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আরও হাসি পাইল তাহার সেই পল্লীবাসিনী প্রৌঢ়ার আশঙ্কার কথা ভাবিয়া। কত মূল্য দেন তিনি তাঁহার এই স্বপ্নবিলাসী ভাবপ্রবণ অক্ষম সন্তানটির পরে।

যাক, উপকারের প্রত্যুপকার তাহাকে করিতে হইবে। স্বপ্নবিলাসের মধ্যে একখানা কাঁচকে সে রত্নের যত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়াছিল। সেই অঞ্চলপ্রান্তটুকু কাটিয়া দিতে হইবে।

দোয়াত কাগজ কলম টানিয়া লইয়া সে পত্র লিখিতে বসিল।

আটটার সময় নলিনীর ডিসপেন্সারী যাইবার সময়। কিন্তু উত্তেজনাবশত গত রাত্রে নলিনীর ভাল ঘুম হয় নাই। প্রাতঃকালেই নিয়মমত স্নান সারিয়াও দেখিল শরীর তখনও যেন তেমন সুস্থ নয়। সে স্থির করিল, ডিসপেন্সারীতে আজ আর সে যাইবে না।

চিঠিখানি গতকালই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে সঞ্জীব পাইবে। তাহার মনে আবার ঐ চিন্তা আসিয়া পড়িল।

সঞ্জীবেরও কি আকর্ষণ জন্মিয়াছিল তাহার উপর? না, তাহার অতি সাবধানী মায়ের কল্পনা এ? আবার তাহার ঠোঁটে দেখা দিল সেই হাসি। উঃ, কত বড় মূর্খের মত অন্ধ আবেগে ছুটিয়াছিল সে!

—নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী চমকিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া সঞ্জীব ভিতরে প্রবেশ করিল। মুহূর্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া নলিনী বলিল—আপনি?

হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ। অবাঞ্ছিত অতিথিই বটে। আপনার পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি মর্যাদাহানি সহ্য ক তে পারি নে। সেইজন্য তার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

নলিনীও মাথা তুলিল দৃপ্ত ভঙ্গিতে। তারপর ধীরে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল—বলুন!

সঞ্জীব বলিল—শুধুমাত্র যদি আপনি আমায় এখানে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখতেন তা হলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু কারণের উল্লেখ করে আপনি আমার মর্যাদায় আঘাত করেছেন।

আপনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্বন্ধ পাতিয়েছিলাম কমরেড-এর। কর্মের পাকে আর বিপাকেই বলুন আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

নলিনী বাধা দিয়া বলিল—সে ঋণ, সে কৃতজ্ঞতা আমি অস্বীকার করি নে সঞ্জীববাবু। কিন্তু নারী-পুরুষের কমরেডশিপে আমার আস্থা নাই।

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—এইখানে আপনি আমায় সব চেয়ে বড় অপমান করেছেন। আমার অন্তরের আন্তরিকতায় দোষারোপ করেছেন।

নলিনী বলিল—যদি করেই থাকি সঞ্জীববাবু, তবু সে মিথ্যা করি নি। আপনার মনের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। নইলে আমি চলে এলে আপনার বাড়ি অকস্মাৎ শ্রীহীন হয়ে উঠল কেন শুনি?

সঞ্জীব দৃঢ়ভাবে বলিল—আমার দুর্ভাগ্য যে আপনি স্ত্রীলোক। আপনি পুরুষ হলেও আপনার বিদায়ের পর আমার বাড়ি ঠিক এমনি শ্রীহীনই ঠেকত নলিনী দেবী।

নলিনী সহসা এত বড় অপমানজনক কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে ধীরে ধীরে বলিল—তাহলে তো আর আপনার মর্যাদাহানির কথাই উঠতে পারে না সঞ্জীববাবু। আমার নিক্ষিপ্ত বিষবাণ আমার বুকেই ফিরে এসে বিঁধল।

সঞ্জীব কথার উত্তর দিল না। মনে তাহার রুক্ষতার জন্য অনুতাপ দেখা দিয়াছিল।

নলিনী বলিল—আর পত্রেও তো আপনি আমার প্রতি আকৃষ্ট এমন কথা লিখি নি আমি। আমি লিখেছি—

আর সে বলিতে পারিল না। অবরুদ্ধ অশ্রুর পীড়নে রক্তিম মুখে সে অন্য দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিল।

অনুতাপে লজ্জায় সঞ্জীব আপনাকে এবার অপরাধী না ভাবিয়া পারিল না।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নলিনীর হাত দুটি ধরিয়া বলিল—আমায় মাপ করুন নলিনী দেবী।

ধীর আকর্ষণে হাত দুইটি ছাড়াইয়া লইতে লইতে নলিনী বলিল—ছাড়ুন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া সে কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু সে বলা তাহার হইল না। তাহার পরিবর্তে রোষে ক্ষোভে রক্তিম হইয়া সে বলিয়া উঠিল—রমা!

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সঞ্জীব দেখিল, ও-ঘরের অর্ধোন্মুক্ত জানালার অন্তরালে জাগিয়া রহিয়াছে রমার মুখ। সমস্ত মুখে তাহার কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে। বিচিত্র একাগ্র দৃষ্টিতে সে এই দিকেই চাহিয়া ছিল।

নলিনী আবার ডাকিল—রমা!

রমা যেন সম্বিৎ পাইয়া সরিয়া গেল।

নলিনী দ্রুতপদে ও-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই সঞ্জীব শুনিল নলিনী বলিতেছে—এত বড় নির্লজ্জ তুমি রমা! ছি, তোমায় আমি ভাল মনে করতাম!

নলিনী এ-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সঞ্জীবকে বলিল—ওকে কি আপনি আজই নিয়ে যাবেন?

সঞ্জীব বলিল—সে-কথায় আলোচনাও করবার আছে মিস গাঙ্গুলী। ওর ভার আপনি নিন। দেখেশুনে বিয়ে দিন।

নলিনী হাতজোড় করিয়া বলিল—মাফ করবেন সঞ্জীববাবু। রমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া ও এখানে থাকা মানেই আপনার আমার মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা। সে-সূত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে ছিন্ন হয়ে যাক।

সঞ্জীব বলিল—তা হলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী। কাল এসে ওকে আমি নিয়ে যাব।

পরদিন গাড়িতে জিনিসপত্র তুলিয়া রমা ও সঞ্জীব গাড়িতে চড়িয়া বসিল। দুয়ারের সম্মুখেই নলিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সঞ্জীব হাস্যমুখেই বলিল—নিজেদের সমাজে বিবাহ করবেন লিখেছেন। কায়মনোবাক্যে কামনা করি আপনি সুখী হন। কিন্তু কমরেডকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না। আমরা ইতরজন, শুধু মিষ্টান্নের প্রত্যাশী।

নলিনী দুটি হাত জোড় করিয়া বলিল—কমরেড আর নয় সঞ্জীববাবু। ও সম্পর্কের আজ থেকে অবসান হোক।

সঞ্জীব বলিল—এর চেয়ে বড় কোন সম্পর্ক আপনার সঙ্গে যে ধারণা করতে পারি নে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী তখন আর সেখানে ছিল না।

সঞ্জীবদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল বেলা পাঁচটায়। রমাকে সঙ্গে লইয়া সঞ্জীব বাড়ি আসিয়া ডাকিল—মা!

সম্মুখেই ঘরের মধ্যে চোখে চশমা দিয়া মা সেলাই করিতেছিলেন। ছেলের ডাকে তিনি মুখ তুলিলেন। মুখ তুলিয়া কিন্তু আর উত্তর দেওয়া তাঁহার হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন রমাকে। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—রমা নয়!

মায়ের বিস্ময়ের হেতু সঞ্জীব বুঝিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ। সে রমা আর আর নেই মা!

গম্ভীরভাবে মা উত্তর দিলেন—তাই দেখছি। কিন্তু ওকে নিয়ে এলি যে! টেনে জঞ্জাল ঘাড়ে করা কি তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল সঞ্জীব?

জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে সঞ্জীব বলিল—নলিনী আর ওকে রাখতে চাইলেন না, মা।

—কেন?

একটু ইতস্তত করিয়া সঞ্জীব বলিল—সে অনেক কথা মা। মোট কথা তিনি আর আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না। রমাও তো আমাদের লোক।

সঞ্জীব আবার বলিল—যতখানি বস্তু নলিনীর মধ্যে প্রত্যাশা করেছিলাম মা, তা তাঁর মধ্যে নেই। নিতান্ত সাধারণ মেয়ে নলিনী।

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মানুষের চরিত্র কাচের মত জিনিস নয়, তাকে এক নজরে চেনা যায় না বাবা। কাজ দেখেও বিচার করা সম্ভব নয়। কাজের আড়ালে থাকে কারণ। সেই কারণ না জেনে বিচার করতে গেলে ঠকতে হয় বাবা।

সঞ্জীব এ কথার কোন উত্তর দিল না। সে রমাকে বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে কেন রমা? বস তুমি।

মৃদুস্বরে রমা কহিল—হাত-পা ধুয়ে আসি আমি।

সে চলিয়া গেলে সঞ্জীব বলিল—ওর বিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম মা। নলিনীও আমায় সেই কথাই বলছিলেন।

মা বলিলেন—হুঁ। কিন্তু এ কথাটায় কি তুই আমার সম্মতি পেতে আশা করিস সঞ্জীব?

—উচিত যা, তাই তোমার কাছে প্রত্যাশা করি মা।

দৃঢ়কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন—বিধবার বিয়ে আমার কাছে অধর্ম। উচিত অনুচিতের অনেক উপরে।

—তাহলে ওর কি ব্যবস্থা করব মা?

—যা তোমাদের খুশী। আমার মতের সঙ্গে এখানে তোমাদের মতের মিল হবে না। ওকে এখানে আনাই তোমার ভুল হয়েছে।

একটু চিন্তা করিয়া সঞ্জীব বলিল—সত্যিই কাজটা অবিবেচনার হয়ে গেছে মা। এখন উপায় এক তোমার আশ্রয়।

মা বলিয়া উঠিলেন—না সঞ্জীব, ওকে বাড়িতে আমি রাখতে পারব না। ওকে তুমি ওর বাপের ওখানে রেখে এস।

—সে যে ওর সর্বনাশ করা হবে মা!

অকস্মাৎ রুক্ষ হইয়া মা বলিলেন—দেশের লোকের সর্বনাশ দেখবার আমার কিছু কথা নেই সঞ্জীব; ও আগুনের খর্পর আমি বাড়িতে রাখতে পারব না।

সঞ্জীব এমন কথা তাহার মায়ের নিকট হইতে প্রত্যাশা করে নাই। মায়ের জন্য অন্তরে অন্তরে তাহার একটা অহঙ্কার ছিল। হোন তিনি কটুভাষিণী, কিন্তু সঞ্জীবের ভাল কাজে কখনও তিনি বিদ্রোহ করেন নাই। এমন কি আপন ধর্মাচরণের প্রবল নিষ্ঠা, সুকঠোর শুচিতা বিপন্ন হইলেও না। আজ তাঁহার কথায় সঞ্জীব একটু আঘাত পাইল। সে মায়ের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের গন্ধ পাইল। সে উত্তপ্ত স্বরেই বলিল—একটা দিন অপেক্ষা কর মা। কালই ওকে নিয়ে আমি কলকাতায় যাব। কোথাও-না-কোথাও ওর স্থান হবেই।

মা বলিলেন—বেশ, তাই যেয়ো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বর এত উগ্র হল কেন?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—তোমার ওপর অভিমান করবারও কি অধিকার নাই আমার, মা ?

মা উত্তর দিলেন, কিন্তু পূর্বের কণ্ঠস্বরে নয়। বিচিত্র এ কণ্ঠস্বর। বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর মত মমতায় উজ্জ্বল বেগবতী, মুমূর্ষের অকপটোক্তির মত সকাতর মর্মস্পর্শী সে স্বর। তিনি বলিলেন—সঞ্জীব, সংসারে সকল মায়ের সব চেয়ে বড় কাম্য কি জানি নে বাবা। কিন্তু তোর মায়ের কাম্য শুধু তোর চরিত্র, তোর সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তা হলে যে মৃত্যু ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না বাবা।

দিনের উপর মৃত্যুর স্পর্শের মত রাত্রির ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। ম্লান সন্ধ্যালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও সঞ্জীব স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার তেজস্বিনী মায়ের চোখে জল দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই বাড়ির বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবাজী, রয়েছ নাকি বাড়িতে ? ওগো বাবাজী সঞ্জীব !

একটা হ্যারিকেন হাতে লইয়া সঞ্জীব বাহিরে আসিল। দেখিল বাহিরের দাওয়ার ওপর আলো হাতে দাঁড়াইয়া কড়ি গাঙ্গুলী। মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিল সঞ্জীব।

এককড়ি গাঙ্গুলী বলিল—এলে কখন বাবা কলকাতা থেকে ? শরীর ভাল আছে ?

শুষ্কভাবেই সঞ্জীব বলিল—আজ বিকেলেই এসেছি। শরীরও বেশ ভালই আছে।

—বেশ, বেশ। তোমাদের ভাল হলেই আমাদের ভাল। তারপর তোমার সঙ্গে যে কথা ছিল বাবাজী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, একটা কিছু আন না বাবাজী, পেতে বসা যাক।

বাহিরের ঘর হইতে একখানা কম্বল আনিয়া সঞ্জীব অগত্যা বিছাইয়া দিল। গাঙ্গুলী তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল—বস বাবাজী, বস। উঃ শীতও আচ্ছা পড়েছে এবার। বুড়ো হাড় আমাদের কনকন করছে। তার ওপর বাতব্যাধি, কদিনই বা বাঁচব আর—হরিবোল হরিবোল।

সঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল। এ-কথার উত্তরে বলিবার মত কিছু সে খুঁজিয়া পাইল না।

গাঙ্গুলী বলিল—তারপর বাবাজী, রমা আমাদের বেশ ভাল আছে তো ? আহা বাবা, তোমার কৃপাতেই হতভাগিনীর একটা গতি হল।

সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, ভালই আছে রমা। তাহার মনের মধ্যে আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন নির্লজ্জ পাষণ্ড যে মানুষ হইতে পারে এ ধারণা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। কড়ি গাঙ্গুলী তাহার অপরিচিত নয়, পাষণ্ড বলিয়াই তাহাকে সে জানিত। কিন্তু তবু তাহার ধারণা ছিল, কড়ি গাঙ্গুলী আর তাহার চোখে চোখ জুড়িতে পারিবে না।

গাঙ্গুলী বলিতেছিল—তাই তো বলি বাবা, আমাদের সব ছেলেগুলোকে, শিখবি যদি তবে আমাদের সঞ্জীবকে দেখে শেখ। বিদ্যের গুণ দেখ। বর্ষার জলভরা মেঘ যেন, যেদিকে যাবে ছায়ায় জলে সব শীতল করে দিয়ে যাবে।

সঞ্জীবের মনের মধ্যে বিরক্তি ঘৃণা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়াও বাঁকা ভাবেই সে বলিয়া ফেলিল—আপনার স্নেহের কথা আমি ভাল করেই তো জানি গাঙ্গুলী কাকা।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাঁটুতে হাত দিয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—গুরুর দিব্যি, ইষ্ট দেবতার দিব্যি। মিথ্যে বলি তো মাথায় বজ্রেরাঘাত হবে বাবা, এ কাজ আমার নয়। ওই পাষণ্ড আমাকে ঘরে ভরে বন্দুক দেখিয়ে দলিলখানা কেড়ে নিলে আমার কাছ থেকে।

সঞ্জীবের বিরক্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল।

গাঙ্গুলী আবার বলিল, যে জবাব তুমি দিয়েছ বাবাজী, বুঝেছ কি না, ওতেই কিস্তিমাৎ। ওর ঠেলা—

—বামুন কাকা!

গাঙ্গুলীর কথা অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া দরজার আলোকিত মধ্যস্থলে রমাকে দেখিয়া হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সবিস্ময়ে সে যেন প্রশ্নই করিল—রমা! রমা তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লণ্ঠনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া গাঙ্গুলী কহিল—আহা-হা মা, চোখ জুড়োল তোকে দেখে। এমন হয়েছিস তুই, অ্যাঁ! একেই বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস।

রমা সলজ্জভাবে বলিল—আমাদের বাড়ির সব ভাল আছে কাকা?

—আর ভাল মা! তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে তোর মা নদী-গঙ্গা ভাসিয়ে দিলে। চারিদিকে খোঁজখবর করে কোন পাত্তা পাই না। কেউ বলে মরেছে। কেউ কিছু—তা একটা খবরও তো দিতে হয় বাপু। তারপর খবর পেলাম, সঞ্জীব দয়া করে তোকে কলকাতায় রেখে ডাক্তারী না কি শেখাচ্ছে।

রমা প্রশ্ন করল—খোকা ভাল আছে?

—হ্যাঁ। দিন .ত তোর নাম করে। বলব আমি তোর বাবাকে—হ্যাঁ, দেখে এস গিয়ে তোমার মেয়েকে। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে এস।

সঞ্জীব বলিল—যাও এখন, ভেতরে যাও রমা।

কুণ্ঠিতভাবে রমা বলিল—যাই। কিন্তু তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিতর হইতে সঞ্জীবের মায়ের ডাক আসিল—রমা!

রমা আর দাঁড়াইতে সাহস করিল না। ভিতরে চলিয়া গেল।

গাঙ্গুলী বলিল—একটা কথা বলছিলাম বাবাজী!

—বলুন।

—একটা মিটমাট করে ফেল বাবাজী। জান তো, দুষ্টকে দূরে হতে করি পরিহার!

সঞ্জীব বলিল—আমার শরীরটা বেশ ভাল নেই গাঙ্গুলী কাকা। আমি উঠছি। মাপ করবেন আমাকে। সে আলোটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—দাঁড়াও বাবা। হ্যারিকেন বদল হল কিনা দেখে নিই, দু মাস হল

কিনেছি—আমার আবার নতুন আলো!

সঞ্জীব হাসিয়া বলিল—আমারটা আরও নতুন। আজই কলকাতা থেকে এনে জ্বেলেছি।

তবুও গাঙ্গুলী আপন হ্যারিকেনটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া রাস্তায় নামিল। যাইতে যাইতে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবাজী!

সঞ্জীব তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ভোরবেলায় সঞ্জীবের তখনও ঘুম ভাঙে নাই। মা ডাকিলেন—সঞ্জীব, সঞ্জীব!

সঞ্জীবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উত্তর দিল—মা!

—উঠে আয় শীগগির।

গায়ের কাপড়টা জড়াইয়া লইয়া সঞ্জীব দরজা খুলিয়া বলিল—কি মা?

—বাড়ীর চারিদিকে পুলিস।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিল—পুলিস! পুলিস কেন মা?

মা বলিলেন—বলতে তো পারবো না বাবা। গ্রহ-নক্ষত্রের কথা জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মে গণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ষড়যন্ত্রের কথা কোন শাস্ত্রমতেই তো জানা যায় না বাবা। দেখ তুই এগিয়ে দেখ।

বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিল—সম্মুখেই দাঁড়াইয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টরবাবু।

সঞ্জীবকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—নমস্কার সঞ্জীববাবু। আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে। বাড়ীটাও সার্চ করে দেখতে হবে।

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—অপরাধটা কি শুনতে পাই না?

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—বলতে আমারও লজ্জা হচ্ছে সঞ্জীববাবু। অপরাধ আপনার দাঁড়াচ্ছে নারীহরণ। রমণদাসের নাবালিকা কন্যা রমা দাসীকে অসদভিপ্রায়ে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন—। সে কি আপনার বাড়ীতে আছে?

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আছে। রমা—রমা! মা, রমাকে পাঠিয়ে দাও তো।

রমা বাহিরে আসিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার পিতা রমণদাস তাহাকে দেখিয়া একটা কৃত্রিম ক্রন্দনে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সাব-ইন্সপেক্টর তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন—চুপ কর বেটা বদমাস চোর। তারপর সঞ্জীবকে বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, শেষ পর্যন্ত আপনার মাকেও না জড়ায়!

সঞ্জীব বলিল—অপরাধ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি সাব-ইন্সপেক্টরবাবু। তারপর আবার বলিল—একটু অপেক্ষা করুন, আমি গায়ে জামাটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আসি।

সাব-ইন্সপেক্টর বলিলেন—তাই তো সঞ্জীববাবু, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যে সীমা দেখতে পাচ্ছি না। এমন একটা অপরাধ—

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—অপরাধ কারও নয় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু, এ আমার স্বখাত সলিল।

মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া সঞ্জীব ডাকিল—মা!

তেজস্বিনী মায়ের ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নীরবে তিনি ছেলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রব সংযত হইলেও রোদন বাঁধ মানিল না, দরদর ধারে দুই চোখ বাহিয়া সঞ্জীবের নতমস্তকে ঝরিয়া পড়িল।

দিন কয় পর।

সেই আয়না-ঘরের মধ্যে রমাও আজ আবার দাঁড়াইয়াছিল। রমা বাবুর বাড়িতে আসিয়াছে। সঞ্জীবের গ্রেপ্তারের পর সে বাড়ি গিয়াছিল। সমস্ত ঘটনা সে বুঝিয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ উদ্বেগ তাহার ছিল না। রমার মা বলিয়াছিল—খোকাবাবুকে মানুষ করবার জন্যে আবার তোকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন বাবুরা। দেখ, যাবি তুই?

মায়ের মুখের উপর চকিত একটি দৃষ্টি হানিয়া সে সলজ্জভাবে মুখ নত করিয়াছিল। মায়ের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিতের আভাস তাহার কাছে আজ অপ্রকাশ রহিল না।

বুকের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ঘন আবেগ গর্জনমান উতলা মেঘের মত মুখর হইয়া উঠিল। সে অনুভব করিল, বাহির পর্যন্ত তাহার সে গর্জনের প্রতিধ্বনিতে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। হৃদ্‌স্পন্দন ঘনবেগে দ্বিগুণিত হইয়া উঠিতেছিল।

চকিতে তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছিল—সেই ঘর সেই দুয়ার। ঘরের মধ্যে চেয়ারের উপর যেন বাবু বসিয়া আছেন, টেবিলের উপর চায়ের কাপে সে যেন সলজ্জ নতমস্তকে চা ঢালিয়া দিতেছে। সে অনুভব করিল বাবুর সস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি যেন তাহার সর্ব অবয়বে আরতি করিয়া ফিরিতেছে। সলজ্জ পুলকে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল।

পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল—খোকাবাবুর সুকুমার ছবিখানি। খোকাবাবুকে কোলে লইয়া সে যেন মৃদুস্বরে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেছে। অকস্মাৎ যেন বাবু আসিয়া গেলেন। অনাবৃত মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। দুষ্ট খোকা যে কাপড় চাপিয়া ধরিতেছে। বাবুর অধরে মৃদু হাস্যরেখা। সমস্ত দেহ তাহার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দেহে রক্তধারা যেন উত্তাল তরঙ্গে আবর্তিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার পট পরিবর্তিত হইয়া গেল।

তাহার মনে হইল—সেই আয়না-ঘরে বসিয়া সে যেন চুল বাঁধিতেছে। হাতের কাছে সরু-দাঁড়ার চিরুনিটা যে নাই। ঝি-কে ডাকিয়াও যে পাওয়া যায় না। ঝি-টা বড় অবাধ্য

হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে তিরস্কার করা দরকার। এ কল্পনায় মন তাহার ভরিয়া উঠিয়াছিল।

আজ আয়না-ঘরে দাঁড়াইয়া সেই সব ছবিগুলি আবার তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অধরে বিকশিত হইয়া উঠিল হাসির কুঁড়ি। উপরে দেওয়ালের গায়ে সেই ছবিগুলি। আজ রমা ভাল করিয়া ছবিগুলি দেখিতে লাগিল। পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ মেয়েটির মুখে কি বিচিত্র হাসি! রমার মুখ হইয়া উঠিল গাঢ় রক্তিম।

এপাশে আর একখানি ছবি। অর্ধনগ্ন একটি মেয়ে। তাহার এলানো চুলের কয়টা গোছা নগ্ন বুকের উপর ঘুমন্ত কালো সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িয়া আছে। বুকের কাপড় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে আপন শুভ্র-সুন্দর বক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ছবিখানি দেখিতে রমার বিমূঢ় মনে কি ইচ্ছা হইল কে জানে! সেও আপনার বক্ষবাস মুক্ত করিয়া নগ্ন বুকের দিকে চাহিয়া দেখিল। দর্পণে দর্পণে সেই প্রতিবিম্ব। রমা মুখ তুলিয়া দর্পণের দিকে চাহিতেই তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল সলজ্জ মৃদু হাসি।

অকস্মাৎ দরজা খোলার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে দশ-বারোটি পুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

রমা চিনিল—চারিদিকের দর্পণে বাবুর প্রতিবিম্ব। সলজ্জ ত্রস্তভাবে সে বক্ষাবরণ সুবিন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই সে পুরুষের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে লীন হইয়া গেল।

দর্পণে দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। রমা একসময় সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার কমনীয় হাত দুখানি কখন পুরুষটির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। লজ্জায় সে চোখ বুজিল।

নলিনী বজ্রহতার মত স্তম্ভিত নির্বাক হইয়া গেল, সঞ্জীবের প্রতি বিচারকের দণ্ডাদেশ শুনিয়া। পাঁচ বৎসরের কঠোর কারাবাসের আদেশ। সঞ্জীব যেমন স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। সঞ্জীবের তরফের উকিল নলিনীকে পত্র দিয়া আনাইয়াছিলেন। সঞ্জীবের নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে সকলের চেয়ে বড় সাক্ষী সে-ই। লাঞ্ছনার তাহার সীমা রহিল না। আদালতের কঠোর বাস্তবতা সম্বন্ধে জ্ঞান তাহার ছিল না। কাজেই এতখানি সে প্রত্যাশা করে নাই।

বিপক্ষ হইতে সরকারী উকিল তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি মহেন্দ্রবাবুর উপপত্নী ছিলে? নলিনীর মুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল। মাথা যেন তাহার আপনি নত হইয়া মাটির

বুকের মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। মনে হইল পৃথিবীর বায়ু যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে। উকিল ধমক দিলেন—চুপ করে থাকলে চলবে না, উত্তর দাও!

আপনাকে সংযত করিয়া নলিনী দৃপ্তভাবে মাথা তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল। কিন্তু বাধা দিল সঞ্জীব। সে কোন কিছু উচ্চারণ করিবার পূর্বেই সঞ্জীব বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল—মহামান্য বিচারকের কাছে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইয়াছিল সে রমার এজাহার শুনিয়া। সেই রমা—সুদীর্ঘ একটা মিথ্যা ইতিহাস সুচারুভাবে গুছাইয়া গুছাইয়া তোতাপাখির মত আওড়াইয়া গেল। এক চুল এদিক ওদিক করিল না। চকিতা হরিণীর মত সে এক-একবার সঞ্জীবের দিকে চাহিতে লাগিল। আর এক-একবার চাহিতেছিল সে, যেদিকে মহেন্দ্রবাবু বসিয়া ছিলেন সেইদিকে।

রায়ে বিচারক রমার সম্বন্ধে মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, আসামীর মত দৃঢ় চরিত্রের শিক্ষিত যুবককে এই জঘন্য অপরাধে অপরাধী বিশ্বাস করা যেমন কঠিন, বাদিনী রমার মত একান্ত সরলা মেয়েটির বর্ণিত সকরুণ ইতিহাস অবিশ্বাস করাও তেমনি কঠিন।

এমনি করিয়া বিচারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

নলিনী নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া বিচারালয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। চেতনা হইল তাহার সঞ্জীবের ডাকে।

ডক হইতে বাহির হইয়া সঞ্জীব ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী!

নলিনীর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না।

সঞ্জীব বলিল—যেটুকু অসম্মান আপনার হয়ে গেল তার ওপর আমার হাত ছিল না। আমায় মাফ করবেন।

নলিনী কোন কথা কহিল না। কহিল না নয়, কহিতে পারিল না। একটা শোকার্ত আবেগে অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

সঞ্জীব সেটুকু বুঝিল। সান্ত্বনা দিয়াই সে বলিল—হাসিমুখে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিন মিস গাঙ্গুলী। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পাথেয় চাই আমার। আপনাদের উৎসাহ—মায়ের আশীর্বাদ আমার সেই পাথেয়।

বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নলিনী এতক্ষণে বলিল—এ কি করলেন আপনি? আমার লাঞ্ছনা নিবারণ করতে মিথ্যা দোষ আপনি স্বীকার করে নিলেন?

সঞ্জীব বলিল—দোষ স্বীকার না করলেও এ জাল থেকে উদ্ধারের আমার উপায় ছিল না। বড় সুকৌশলে জাল রচনা করেছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

একটু নীরব থাকিয়া নলিনী বলিল—কিন্তু এরই নাম কি বিচার?

—ভুলকে এড়াবার পথ যে মানুষের নেই নলিনী দেবী। বিচারকও যে মানুষ। আর তাঁরই বা দোষ কি বলুন? মানুষ যতদিন মিথ্যা বলতে না ভুলবে, বিচারককেও ততদিন ভুল করতে হবে। তবু মানুষের মহত্ত্ব যে সে বিচার করবার চেষ্টা করে।

কনেস্টবল সঞ্জীবকে বলিল—চলিয়ে, চলিয়ে।

সঞ্জীব হাস্যমুখে বলিল—তাহলে নমস্কার মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী বলিয়া উঠিল—মাকে কিছু বলবেন না?

সঞ্জীব চলিবার জন্য বিপরীত মুখে ঘুরিয়াছিল, সে আবার ফিরিল, ঠোঁট দুইটা এবার কাঁপিয়া উঠিল। চোখের বুকে বিন্দুর মত ছোট হইয়া আকাশের সূর্য তখন প্রতিবিম্বে ধরা দিয়াছে।

একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—না, কিছু বলব না। জেলের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার সে দাঁড়াইল।

নলিনী তাহার গমনপথের দিকেই চাহিয়াছিল, চোখে চোখ মিলিতেই সঞ্জীব বলিল—বলবেন, সঞ্জীব আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছে।

সঞ্জীবের বার্তা সে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু যাইবার মুখে পথে পা দিয়া সে অনুভব করিল—কি ভীষণ সে গুরুভার! তাহার বুক যে সে গুরুভারের পেষণে ভাঙিয়া যাইতেছে। মায়ের সম্মুখে এই বার্তা লইয়া দাঁড়াইবার কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া উঠিল। সে তো জানে, কত আশা কত কল্পনা কত অহঙ্কার এই সন্তানটিকে লইয়া সেই তেজস্বিনী প্রৌঢ়ার। আবার তেমনি সুগভীর মমতায় অন্ধ তিনি। আজও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানটিকে শিশুর মত নিজের উপদেশে চালিত করার প্রবৃত্তি তাঁহার যায় নাই। না হইলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, শঙ্কা যায় না। নলিনীর ইচ্ছা হইল একখানা পত্রে সমস্ত জানাইয়া তাহার কর্তব্য শেষ করে। কিন্তু তাও সে পারিল না। দ্বিধার মধ্যে ট্রেনে চলিয়াছিল। অবশেষে পরের ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যার সময় সে সঞ্জীবের গ্রামে আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়া একান্ত একাকী সে সঞ্জীবের বাড়ির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া সে বাড়ি ঢুকিবে? বার বার তাহার মনে হইল, না আসিলেই সে ভাল করিত!

বাড়িখানা নিস্তব্ধ—যেন থম্‌থম্ করিতেছে। ম্লান সন্ধ্যালোক গৃহবেষ্টনীর মধ্যে গাঢ় অন্ধকারের রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নলিনী ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝ-আঙিনায় দাঁড়াইল।

কোথাও কোন সাড়া নাই। জনহীন নীরবতার মধ্যে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক নিস্তরঙ্গ প্রবাহের মত একটানা তীক্ষ্ণস্বরে অবিশ্রান্ত বহিয়া চলিয়াছে। নলিনী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। শুধু মাটির বুক হইতে পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঘনাইয়া ঘনাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—অবরুদ্ধ প্রগাঢ় বেদনার মত।

সহসা তাহার মনে হইল, ও-পাশের মুক্তদ্বার ঘরখানার মেঝের উপর কে যেন পড়িয়া আছে। বুকখানা তাহার চমকিয়া উঠিল।

শঙ্কিত পদে অগ্রসর হইয়া সে দেখিল, সত্যই তিনি মা। অনুচ্ছ্বসিত গভীর বেদনায় স্থিরভাবে মাটির বুকে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছেন। স্পর্শ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে সকরুণ স্বরে ডাকিল—মা!

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা মুখ তুলিতে তুলিতে বলিলেন—কে?

উত্তর নলিনীর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে নীরবে আপনার উচ্ছ্বাস দমিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টায় নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা মুখ তুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—নলিনী! এস মা বস। তারপর চারিদিকের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—উঃ, সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে! এখনও সন্ধ্যে জ্বালা হয় নি। তুমি একটু বস মা নলিনী। আমি সন্ধ্যেটা জ্বেলে ইষ্ট স্মরণ করে নিই।

নলিনী বিমূঢ়ার মত বসিয়া রহিল। সে শুধু ভাবিতেছিল, মাকে সে সংবাদ দিবে কেমন করিয়া?

সমস্ত কর্তব্য শেষ করিয়া আলো হাতে মা আসিয়া বলিলেন—মুখে-হাতে জল দাও মা নলিনী। ট্রেনে এসেছ, কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেল। আমি উনানটা ধরিয়ে ফেলি, তুমি চায়ের জল একটু চড়িয়ে দাও।

নলিনী মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল—না মা, চা আমি খাব না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন—আজ দু-মাস চায়ের সরঞ্জাম নামানো হয় নি আমার। আবার পাঁচ বছর পার না হলে আর নামানো হবে না। জান কি মা নলিনী, জেলে চা দেয় কিনা?

নলিনী নীরব হইয়া রহিল।

প্রদীপের আলোয় মা দেখিলেন, নলিনীর চোখের তলের মৃত্তিকা বিন্দু বিন্দু করিয়া ভিজিয়া উঠিতেছে। তিনি বলিলেন—কাঁদছ মা নলিনী! আমিও অনেক চেষ্টা করলাম কাঁদবার, কিন্তু কান্না এল না। একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ঊর্ধ্বমুখে শীত-শেষের গভীর নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব হইলেন।

আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে শুক্রগ্রহ দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহার প্রভায় রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রায়ান্ধকার আলোকের মধ্যেও সে অনুভব করিল, মায়ের প্রশান্ত মুখখানি বেদনার্ত গভীর উদাসীনতায় সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে, কৃষ্ণ-রাত্রির সমুদ্রের মত। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি বলিলেন—হারাণ এসে আমায় খবর দিলে। আমি শুকনো চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম শুধু। মুখে কথা এল না, কান্না এল না। সে বোধ হয় আশ্চর্য হয়েই চলে গেল। তারপর এই এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সঞ্জীবের বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত কত কথাই একে একে মনে করলাম। বুকের মধ্যে কান্না তোলপাড় করছে, কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ যেন পাচ্ছে না।

নলিনী ডাকিল—মা! তাহার শঙ্কা হইল মায়ের সংজ্ঞা বোধ হয় লোপ পাইতেছে।

মা বলিলেন—সঞ্জীব আমায় কিছু বলে যায় নি? হারাণ বলছিল, যাবার সময় তোমার সঙ্গেই শুধু তার কথা হয়েছিল।

একান্ত অপরাধীর মত নলিনী বলিল—বলেছেন।

মা ধীরভাবে কথাটি শুনিবার অপেক্ষায় রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে নলিনী বলিল—বলেছেন, মা যেন আমার ফেরবার অপেক্ষায় বেঁচে থাকেন।

মায়ের চোখ দিয়া অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন—তার দোষ নেই। সে ভেবেছে এ আঘাত আমি সইতে না পেরে আত্মহত্যা করব। একথা যে কতবার বলেছি আমি তাকে! যেদিন সে গ্রেপ্তার হয় তার আগের দিন রাত্রেও একথা তাকে আমি বলেছিলাম, মা। বলেছিলাম, সঞ্জীব, সংসারে আমার সব-চেয়ে বড় কাম্য তোর চরিত্রের সুনাম। সেই বস্তুতে যদি কেউ মিথ্যের কালিও মাখিয়ে দেয়, তবে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর পথ থাকবে না। নীরব হইয়া আবার তিনি কাঁদিলেন। তারপর বলিলেন—সেই মিথ্যের কালিই সেই বস্তুতে মাখিয়ে দিলে, তবুও আশ্চর্য এই নলিনী, কই, আমি তো মরবার কল্পনাও করতে পারছি না!

নলিনী বলিল—তিনি আপনাকে বেঁচে থাকতে বলে গেছেন মা।

মা বলিলেন—ভয় নেই মা, সে কল্পনা আমি করি নি। আঘাতের ভয়ে ধর্মকে লঙ্ঘন করতে আমি পারব না। আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার যে কথা সে-ও আমি হেলা করব না মা। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। তার দুঃখে আমি দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু সে আমায় দুঃখ দেয় নি, একথা তাকে বলবার জন্য আমি চেষ্টা করব।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মা সংসারের বন্দোবস্তে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করিলেন। হারাণ বাগ্দীকে ডাকিয়া নানা বন্দোবস্তের কথা হইতে লাগিল। সঞ্জীবের পাশের গ্রামবাসী এক বন্ধুকে ডাকিয়া কি সব পরামর্শ হইল। নলিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। এ সংসারে শোভন বলিয়া একটা কথা আছে। তাহাকে নলিনী ভুল বুঝিল না, কিন্তু এই সময়ে সংসারের প্রতি এতটা গভীর অনুরাগ তাহার যেন কেমন মনে হইল।

দিন-দুই পরে সে বলিল—মা, আমি আজ যাব মনে করছি।

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন—কাজের ক্ষতি যদি হয় তোমার, তবে মা বারণ করব না। কিন্তু যদি সে ভয় না থাকে, তাহলে কি আর চার-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পার না?

যতই অসন্তোষ মনে থাক তাহার, অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। মৃদুস্বরে সে বলিল—তাই হবে।

মা বলিলেন—একা এই ঘরে থাকতে হবে ভাবতেও আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে মা। মনে হয় ঘর যেন আমায় গ্রাস করে ফেলবে। ভাবছি কোথাও চলে যাব।

নলিনী বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবেন মা?

—কাশী।

নলিনী নীরব হইয়া রহিল। এ কয়দিনের অবিচারের জন্য অন্তরে অন্তরে অপরাধ বোধ না করিয়া সে পারিল না।

মা বলিলেন—অবলম্বন ভিন্ন তো সংসারে বাস করা যায় না মা। একমাত্র অবলম্বন যখন বিশ্বনাথ আমাকে কোল-ছাড়া করে দিলেন, তখন তাঁকে ছাড়া আর কাকে অবলম্বন করব বল?

গাঢ়স্বরে নলিনী বলিল—দয়া করে আমায় সঙ্গে নেবেন মা?

মা মুখ তুলিয়া নলিনীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—যাবে? তারপর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—আচ্ছা চল।

রমার জীবনে—তারপর?

তারপর উন্মত্ত ব্যভিচারের একটা সুদীর্ঘ বিচিত্র কাহিনী। রমা উন্মত্ত ভাবে বাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। যৌবনের আকস্মিক জাগরণে সে চাহিয়াছিল আত্ম-সম্মানের জন্য পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুবেষ্টনী, সংসার, সন্তান, জীবজগতে কৈশোর-অতিক্রান্ত নারীর কল্পনার বস্তু যাহা কিছু—সব। প্রেম সে বোঝে নাই। কাহাকেও পাইতে কামনা সে করে নাই। সে কামনা করিবার মত আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না। সংসারের ঘটনার প্রবাহের মুখে যেখানে আসিয়া ঠেকিল, সেইটুকুকেই সে অবলম্বন করিল। সঞ্জীবের ছায়া তাহার অন্তরে পড়িতে পারে নাই। প্রখর সূর্যের কিরণদাহে শ্রান্ত-ক্লান্তের মত সসম্ভ্রমে ছায়ার আড়ালে আড়ালেই সে থাকিত। কোনদিন দীপ্ত সূর্যের দিকে ঊর্ধ্বমুখ হইতে তাহার সাহস হয় নাই। মহেন্দ্রবাবুকেও যে সে কামনা করিয়াছিল তাও নয়। কর্মচক্রে যেদিন তাহাকে তাহার বাপ-মা শতমুখে তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন, সেদিন সে কিশোরী নববধূটির মতই আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া অচেনা অজানা একটি পুরুষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল। বিবেচনা করে নাই, বিচার করে নাই, করিয়াছিল শুধু বাপ-মায়ের কথার প্রতিধ্বনি, আপন ভাগ্যের প্রশংসা। এখানকার আদর লাঞ্ছনা সবই একান্ত আপনার বলিয়া সে গ্রহণ করিল। তাই মহেন্দ্রবাবু যখন একটি সুরচিত মিথ্যা কাহিনী তাহাকে পাখির মত পড়াইয়া গেলেন, তখন সে সত্যের দিকে তাকাইতে সাহস করে নাই। সভয়ে ক্লিষ্ট অন্তরেও সে পাখির মত সে কাহিনীটা আয়ত্ত করিল, আপত্তি করিতে পারিল না। শুধু একবার অভ্যাসমত ভীরু সরল চোখের চকিত দৃষ্টি তুলিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আপনা হইতেই সে দৃষ্টি নত হইয়া নিবদ্ধ হইল ধরিত্রীর বুকে।

অপরপক্ষে মহেন্দ্রবাবু কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব রাজ্যের সজাগ মানুষ। জীবনে আয়োজন করেন তিনি প্রয়োজনের জন্য। প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আয়োজন তাঁহার চক্ষে আবর্জনার সামিল। হয়তো সংসারের অধিকাংশ মানুষেরই তাই। কিন্তু এদিকে তাঁহার কঠোরতা

যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি সবল। বৎসর-তিনেক পর সেদিন তিনি কড়ি গাঙ্গুলীর সহিত কথা কহিতেছিলেন—কোন কষ্ট ওর হবে বলে আমি মনে করি নে গাঙ্গুলী। ঘর একখানা কিনে দিয়েছি। তার ওপর কিছু টাকাকড়ি হলেই দিন ওর বেশ চলে যাবে।

কথা হইতেছিল রমাকে বিদায় করিবার। এই অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই রমার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে। সে আজ রোগজীর্ণ।

গাঙ্গুলী বলিল—সেটা কি ঠিক হবে হুজুর? ও কি আর সমাজে ঠাঁই পাবে?

বাবু হাসিলেন। বলিলেন—শাসন করে দেব সমাজকে।

গাঙ্গুলী বলিল—কিন্তু ধর্ম বলেও তো ··

বাবু সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। গাঙ্গুলীর কথা আর শেষ হইল না। বাবু হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—তুমিও ধার্মিক হয়ে উঠলে গাঙ্গুলী! দোহাই তোমার, ভুল আইনের ভয় মত পার দেখাও, কিন্তু ধর্মের কাহিনী তুমি বলো না। তা হলে হয়তো বয়স আর আমার বাড়বে না। এই বয়সেই অমর হয়ে থাকতে হবে।

গাঙ্গুলীর মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না।

বাবু আবার বলিলেন—ধর্মাধর্মসমাযুক্ত লোভমোহসমাবৃত মানুষ আমরা গাঙ্গুলী। আমাদের এই ধর্ম। কায়মনোবাক্যে তাই পালন করি। এর বেশী কিছু ধর্ম বলে মানি না। পালন করতে প্রবৃত্তিও হয় না।

কথাগুলা গাঙ্গুলীর মাথায় হয়তো ঢুকিল না। সে নির্বোধের মত মাথা চুলকাইতে লাগিল।

মহেন্দ্রবাবু অকস্মাৎ উগ্র হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনাভরেই তিনি বলিয়া গেলেন—বলতে পার গাঙ্গুলী, একটা মানুষ বেশী জীব হত্যা করে, কী একটা বাঘ বেশী জীব হত্যা করে! মানুষ অবলীলাক্রমে অলস অবসরে টিপে টিপে পিঁপড়ে পতঙ্গ মেরে থাকে। আমি তো মেরে থাকি। পশুর ব্যভিচারের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, নিয়ম আছে, কিন্তু মানুষের ব্যভিচারের সময় নাই, নিয়ম নাই। হিংস্র পশু খায় শুধু রক্তমাংস, কিন্তু উদ্ভিদ পশু জলচর খেচর কীটপতঙ্গ মানুষের অখাদ্য কিছু নয়। ধর্মের দোহাই আমাকে দিয়ো না গাঙ্গুলী। এইগুলোই মানুষের ধর্ম—এই ধরেই মানুষ বেঁচে আছে আসলে।

গাঙ্গুলী একান্ত নির্বোধের মত বলিল—আজ্ঞে তা তো বটেই, তা তো বটেই।

বাবু হাসিয়া বলিলেন—কথাগুলো তোমার হয়তো কানে গেল না। তা না যাক ক্ষতি বিশেষ নাই। থাক ও-কথা, তোমায় যা বললাম তাই ঠিক। রমার জবাব হয়ে গেল। ওকে তুমি নিয়ে যাও। যদি কখনও কিছু দরকার হয়, তুমি এসে জানিয়ো বা জানাতে বলো।

গাঙ্গুলী বলিল—আপনার বাড়িতে তো দশটা-বিশটা দাসী-বাঁদী রয়েছে। ও যদি এইখানেই—

দৃষ্টিটা একটু তুলিয়া বাবু বলিলেন—তোমার এত সঙ্কোচ হচ্ছে কেন বল তো?

গাঙ্গুলী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া বোধ করি সেই চিন্তাই করিল। অবশেষে বলিল—কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে আমার বাবু!

খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যে বাবু হাসিলেন। তারপর গম্ভীর হইয়াই বলিলেন—না, তা হয় না এককড়ি। পুরাতন কাপড় বাক্সে তুলে রেখে পরিত্যাগ করা আমি পছন্দ করি নে। তুমি ওকে ডেকে বলে দাও। ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও বরং।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—আমাকে মাপ করুন হুজুর।

বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

গাঙ্গুলী মিনতিভরে বলিল—হুজুর!

মহেন্দ্রবাবু অনুরোধের সুরে বলিলেন—তোমাকেই বলতে হবে গাঙ্গুলী। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

একা নির্জনতার অবকাশ পাইয়া গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—পাষণ্ড! বেটা মহা পাষণ্ড রে! কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। ক্ষেত্র এবং কাল সম্বন্ধে চেতনা তাহার মুহূর্তে ফিরিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে দরজাটা অর্ধোন্মুক্ত করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। মনের আক্ষেপ মিটাইয়া সকল কথা বলা তাহার হয় নাই, মৃদুস্বরে সে আবার আরম্ভ করিল—বলে পাপ নাকি বাপকে ছাড়ে না। তা এ কি পাপের কর্তাবাবা না কি রে বাপু! বিন্ধ্যগিরির মত বেটা বেড়েই চলেছে।

তারপর এদিকের দরজাটা ঠেলিয়া সে ডাকিল—কানাই! কানাই!

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—যাই।

গাঙ্গুলী আবার বলিয়া উঠিল—আর এ বেটাও কি জুটেছে রে বাবা! ধম্মরাজের চর, বেহ্মদত্যি! পেভুভক্ত বটে বাবা!

কানাই আসিয়া বলিল—রমাকে ডেকে দিতে হবে নাকি?

—হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। তুই কাজটা সেরে দিলেই তো পারতিস। রমাকে বলে দিগে, ওর জবাব হয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। কি আছে-টাছে গুছিয়ে নিয়ে আজই যেতে হবে আমার সঙ্গে। বুঝলি?

কানাই বলিল—যা বলবেন আপনিই বলুন। বাবু তো আপনাকেই বলতে বলে গেলেন। আমি ডেকে দিচ্ছি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না। দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর রমা আসিয়া প্রবেশ করিল। সত্যই রমা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। সে লাবণ্য শুকাইয়া গিয়াছে। মাথায় সে ঘন কেশ-শোভা নাই। শীর্ণ মুখের মধ্যে এখনও জাগিয়া আছে সেই হরিণীর মত সরল ভীরু দুটি চোখ ও তাহার চাহনি।

রমা কহিল—আমায় ডাকছিলে বামুন কাকা?

গাঙ্গুলী শুধু বলিল—হুঁ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রমা বলিল—খোকার দুধ চড়িয়ে এসেছি আমি, বামুন কাকা।

গাঙ্গুলী বলিয়া উঠিল—সে আর নামাতে হবে না তোকে। তোর জবাব হয়ে গেল।

রমা একদৃষ্টে গাঙ্গুলীর দিকে চাহিয়া রহিল।

গাঙ্গুলী মাথা নত করিল। নতশিরেই সে বলিল—বাবু বলতে বলে গেলেন আমাকে। বুঝলি? চকতির মত দৃষ্টি তুলিয়া গাঙ্গুলী দেখিল রমা এখনও তেমনি ভাবে চাহিয়া আছে। সে আবার বলিল—বুঝলি?

আবার গাঙ্গুলী চাহিয়া দেখিল, রমা এখনও তেমনি দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে। তাহার আর সহ্য হইল না। সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—ড্যাব ড্যাব করে গরুর মত চেয়ে আছে দেখ! আমি কি করব তা? চোখ নামা রে বাপু, চোখ নামা! বলি যা বললাম শুনলি তো? আজই আমার সঙ্গে যেতে হবে। এখানে আর থাকা হবে না।

এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমা প্রশ্ন করিল—আমার জবাব হয়ে গেল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই যেতে হবে তোকে।

—চল।

গাঙ্গুলী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল বিপদ রে বাবা! চল না—চল। একেবারে যেতে হবে। কি কি আছে তোর ভাল করে গুছিয়ে-টুছিয়ে নে, বুঝলি?

রমা বলিল—কিছু তো নিয়ে আসি নি আমি।

আরও দেড় বৎসর পর।

অরুণোদয়ের পরই বন্দীশালার দুয়ার উন্মুক্ত হইল। জীবনের নবপ্রভাতে সেদিনের কারামুক্ত কয়জন বন্দীর সহিত বাহির হইয়া আসিল সঞ্জীব, শীর্ণ দেহ, বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, মুখের নিম্নাংশ দাড়ি-গোঁফে সমাচ্ছন্ন। সুন্দর রঙ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। যেন মরিচাধরা তীক্ষ্ণধার দীর্ঘফলা বিগতগৌরব তরবারি একখানি।

মুক্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া সে একবার চারিদিকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি বুলাইয়া কহিল—আঃ!

চারিদিকে দেখিতে দেখিতে সহসা সে বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল—মিস গাঙ্গুলী!

দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ির নিকট আসিয়া ডাকিল—মিস গাঙ্গুলী!

নলিনী গাড়িখানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রত্যাশায় এদিকে ওদিকে চাহিতেছিল। কণ্ঠস্বরে মুখ ফিরাইয়া নলিনী যেন বেদনার্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। অবশেষে সকরুণ স্বরে শুধু বলিল—আপনি! সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

ম্লান হাসি হাসিয়া সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ, আমি। আপনি এমন হয়ে গেছেন? উঃ, যে শালার পরিশ্রম! কথাটা বলিয়াই সে যেন চকিত হইয়া উঠিল। বলিল—মাফ করবেন মিস গাঙ্গুলী। আজ সাড়ে চার বছর বাস করেছি জঘন্য ইতরমির মধ্যে। ভেতরে এতটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারি নি, সে রোগের বীজাণু আমার মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

নলিনী বলিল—ওসব সাময়িক সঞ্জীববাবু।

বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—আমার তা মনে হয় না। বাইরে যেমন দেখছেন, সে মানুষের কঙ্কাল আমি, ভেতরেও ঠিক তাই। জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় সমস্ত নিঃশেষে অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। চেতনা আছে, চিত্ত নাই। বুকের মধ্যে রাশি রাশি বেদনা যেন রয়েছে, কিন্তু বোধশক্তি নাই। অনুভব করতে পারছি নে। আপনার সঙ্গে কথা কইছি, আমার ভয় হচ্ছে, সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে সংযত হয়ে কথা ভেবে বলতে হচ্ছে।

নলিনী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও সে বলিল—আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন সঞ্জীববাবু। স্থির হোন আপনি।

সঞ্জীব জর্জর ব্যক্তির মত বলিয়া উঠিল—উত্তেজনা যে দুর্বলেরই ব্যাধি। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আমার দেহমন কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু।

ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিয়া উঠিল—আজ আমার সব চেয়ে বড় আশ্বাস কি জানেন? শুনলে ঘৃণা করবেন আমাকে। সব চেয়ে বড় আশ্বাস, মা আমার বেঁচে নেই। এই মূর্তি নিয়ে তাঁর সামনে আমায় দাঁড়াতে হবে না।

নলিনী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সঞ্জীব বলিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?

নলিনী এতক্ষণে বলিল—আপনাকেই নিতে এসেছি কমরেড।

—কমরেড! সঞ্জীব একটু হাসিল।

নলিনী বলিল—গাড়িতে উঠে বসুন।

—গাড়িতে উঠতে হবে? ভাল। সঞ্জীব গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পিছনে পিছনে নলিনী গাড়িতে উঠিয়া ক্যোচম্যানকে বলিল—হোটেলে নিয়ে চল।

সঞ্জীব বলিল—আপনার কাছে ঋণের আমার শেষ নেই। আপনার নিয়মিত পত্রেই শেষের দিকটায় সান্ত্বনা পেয়েছি, আশ্বাস পেয়েছি। নইলে মায়ের সংবাদ না পেলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। আপনি তো বরাবর মায়ের কাছে ছিলেন। মা সে-কথা আমায় জানিয়েছিলেন।

মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—আমার সৌভাগ্য সঞ্জীববাবু, তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন।

সঞ্জীব বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ দেব না। কৃতজ্ঞতার ঋণ ধন্যবাদে শোধ হয় না। কিন্তু কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে। মিথ্যে বলবেন না দয়া করে। মা কি আমার খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন?

নলিনীর চক্ষু সজীব হইয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে সে কহিল—এই কথা বলবার ভার মা আমায় দিয়ে গেছেন। তাঁর সমস্ত ভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত আছে।

অসহিষ্ণু ভাবে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—তাঁর মৃত্যুর কথা বলুন আগে। কত কষ্ট—

বাধা দিয়া নলিনী বলিল—সত্যিই আপনার অন্তরের বহু বিকৃতি ঘটেছে সঞ্জীববাবু। আপনার মাকেও আপনি স্মরণ করতে পারছেন না। কষ্ট কি তাঁকে স্পর্শ করতে পারত

সঞ্জীববাবু? যেদিন আপনার কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে, তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। সেদিন বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তাঁর বক্তব্য আমার সঙ্গে ছিল না। ছিল উপরের সঙ্গে। তার পরদিন থেকেই কাশী যাবার উদ্যোগ আরম্ভ করলেন। বললেন—নলিনী, নিরবলম্বন হয়ে তো মানুষ থাকতে পারে না মা। আমি বিশ্বনাথকে অবলম্বন করতে কাশী যাব। আমার বহু ভাগ্য, আমায়—দয়া করে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়েছিলেন। আপনি দেখেন নি, ভগবানে আমার বিশ্বাস নাই, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, কি গভীর কি বিপুল সে নিষ্ঠা!

শুনিতে শুনিতে দরদরধারে সঞ্জীবের চোখ দিয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গেল। নলিনী নীরব হইলে বলিল—আমার কথা—আমার কথা কি বলতেন তিনি আমায় বলুন!

নলিনী বলিল—আপনার কথা মানুষের কাছে কোনদিন বলতেন না তিনি। আপনার কথা তিনি বলতেন তাঁর বিশ্বনাথের সঙ্গে। তবে আপনাকে বলতে বলে গেছেন তিনি—উদ্গত আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সঞ্জীব ব্যগ্রভাবে বলিল—বলুন বলুন, থামলেন কেন?

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে নলিনী বলিল—মৃত্যুর পূর্বদিন আমায় বললেন, কয়েকটা কথা বলে যাই, সঞ্জীবকে বলো মা তুমি। তোমায় ভার দিয়ে যাচ্ছি। বলো—তার মা হয়ে কোনদিন অনুশোচনা করতে হয়নি আমাকে। সে যে দুঃখে ক্লেশ পেল তারই জন্য দুঃখ আমার। নইলে সে আমায় দুঃখ কোনদিন দেয় নি।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সঞ্জীব বহুক্ষণ কাঁদিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর সৎকার?

নলিনী বলিল—তাঁর নির্দেশমতই করিয়েছি। তিনি বলে গিয়েছিলেন—নলিনী, মণিকর্ণিকা ঘাটে তুমি দাঁড়িয়ে থেকে শ্মশানচণ্ডাল দিয়ে—

সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—চণ্ডাল!

—হ্যাঁ, চণ্ডাল। আমিও সে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। তিনি বললেন—চণ্ডাল বলে ঘৃণা করো না। চণ্ডালের মধ্যে থাকেন আমার বিশ্বনাথ। সঞ্জীব আমার ছোট জাতকে অস্পৃশ্য বোধ করতে নিষেধ করত। জীবন থাকতে তো সংস্কার ত্যাগ করতে পারলাম না। মরে সেই অনুরোধ রাখব। এই নিন তাঁর চিতাভস্ম।

একটি সুদৃশ্য কৌটা হইতে ভস্ম লইয়া সঞ্জীবের ললাটে তিলক পরাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া হোটেলে থামিল।

অপরাহ্ণে ট্রেনে চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া সঞ্জীব ও নলিনী দেশে ফিরিতেছিল। ক্ষৌরকর্মের পর সুপরিচ্ছন্ন শুভ্র পোশাকে কৃশ সঞ্জীবকে দেখিয়া নলিনী একসময়ে বলিল—আপনাকে কেমন বোধ হচ্ছে জানেন?

সঞ্জীব প্রশ্ন করিল—কেমন?

—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত।

ম্লানভাবে সঞ্জীব হাসিল। বলিল—বহ্নি এখনও আছে, বলছেন নলিনী দেবী?

নলিনী বলিল—নিশ্চয়। বহ্নির বিনাশ নাই সঞ্জীববাবু।

অন্যমনস্ক ভাবে সঞ্জীব বলিল—হবে।

দু-পাশের প্রান্তর বহিয়া হু-হু শব্দে ট্রেনখানা চলিয়াছে। জানালার উপর হাত-দুটি ভাঁজিয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া সঞ্জীব কি যেন ভাবিতেছিল। নলিনী বাহিরে পিছন-পানে ধাবমান পারিপার্শ্বিকের দিকে একান্ত অন্যমনস্কের মত চাহিয়া ছিল। একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেনখানা থামিল। কয়জন যাত্রী কামরাখানাকে প্রায় শূন্য করিয়া নামিল। মিনিট দুই বিরতির পর ট্রেন আবার চলিল।

অকস্মাৎ সঞ্জীব ডাকিল—নলিনী দেবী!

নলিনী মুখ ফিরাইল। সঞ্জীব তখন মাথা তুলিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল। সঞ্জীবের সে দৃষ্টি দেখিয়া নলিনী শিহরিয়া উঠিল। প্রশান্ত দৃষ্টি তাহার অস্বাভাবিক উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেহের মধ্যে একটা অস্থিরতা সংযমের শাসন উচ্ছেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। নলিনী ব্যস্ত হইয়া বলিল—শরীর কি অসুস্থ হয়ে পড়ল সঞ্জীববাবু?

সঞ্জীব বলিল—না।

—তবে এমন করছেন কেন আপনি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সঞ্জীব বলিল—কিছু নয়। আপনি আমার মায়ের কথা বলুন।

নলিনী তাহার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ কিছুই বুঝিল না। কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার অন্তরালে বেদনার সন্ধান যেন সে পাইল। সে সুগভীর সহানুভূতির সহিত বাছিয়া বাছিয়া মায়ের জীবনের এই কয় বৎসরের খুঁটিনাটি নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আর একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিল।

সঞ্জীব বলিল—মায়ের কথা মনে করলে দেহে-মনে শক্তি পাই আমি। মাতৃভাগ্যে আমার মত ভাগ্যবান কম লোকই আছে মিস গাঙ্গুলী।

নলিনী গাঢ় স্বরে উত্তর দিল—সে কথা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীব শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নলিনী আবার বলিল—তিনিও তাঁর সন্তানভাগ্যের প্রশংসা করে গেছেন। মনকে আপনি পীড়িত করবেন না।

ইহার পর একটা নিস্তব্ধতায় দুজনেই যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। গর্জনমান গতিশীল গাড়িখানার গতি, গর্জন কিছুতেই সে আচ্ছন্নতাকে যেন স্পর্শ করিতে পারিল না। বাহিরে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছিল। গৈরিক-বর্ণ অসমতল প্রান্তর যেন নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

নলিনী সচেতন হইয়া উঠিল। বলিল—আমাদের নামতে হবে সঞ্জীববাবু।

সঞ্জীবও সচেতন হইয়া বলিল—হ্যাঁ। এই যে, এসে পড়েছি দেখছি। এইখানে একদিন বেড়াতে এসেছিলাম মনে আছে? এই বাংলোটা? এটা তো ছিল না। এই বাংলোটা নূতন হয়েছে দেখছি।

একটা টিলার উপর সুদৃশ্য একটি বাংলো দেখা যাইতেছিল।

নলিনী বলিল—এটা মহেন্দ্রবাবুর বাংলো। এইখানেই তিনি থাকেন এখন। থাইসিস হয়েছে তাঁর।

সবিস্ময়ে সঞ্জীব বলিয়া উঠিল—থাইসিস হয়েছে! তারপর আবার বলিল—শক্তিমান পুরুষ। ওঁর মতকে পথকে আমি ঘৃণা করলেও, ওঁর শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি মিস গাঙ্গুলী।

ঠিক সেই সময়ই এই বাংলোটার মধ্যে খাটে শুইয়া মহেন্দ্রবাবু কথা কহিতেছিলেন প্রধান কর্মচারীর সঙ্গে। তাঁহার অসুখ লইয়াই কথা। তিনি বলিতেছিলেন—ও ডাক্তারদের কথা বাদ দাও তুমি। ওরা যে যা বলে বলুক, এ সারবার রোগ নয়। ওয়াল্টেয়র, পুরী, সিমলে, নৈনীতাল যাওয়া, ও শুধু টাকার শ্রাদ্ধ করা। আমি এখানেই বেশ আছি।

কর্মচারীটি পুরনো লোক। বাবুর বাপের আমল হইতে এখানে কাজ করিয়া চুলে পাক ধরিয়াছে। সে বলিল—সারবে বলেই তো লোকে যায়। অন্ততঃ উপকারও তো হবে।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—সে উপশম এখানেও হবে। রোদ আর মুক্ত বাতাসের এখানে অভাব নাই। থাইসিসের বীজাণু—থাক, এত তুমি বুঝবে না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি আবার বলিলেন—কালই তাহলে তুমি সদরে যাও। না। কলকাতায়ই যাও, এটর্নীর বাড়ি। বিষয় বন্দোবস্তের খসড়াটা করে নিয়ে এস। বিষয় যেন ভবিষ্যৎ পুরুষেও কেউ ভাগ করতে না পারে—নষ্ট করতে না পারে। আমার বংশ যেন চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে। এখানে আর কেউ প্রভুত্ব করছে এ আমি মনে করতেও শিউরে উঠি। গোপীনাথপুরের কি হল? ওটা ও এখনও দিতে চাচ্ছে না?

—না।

—যেমন করে পার যত দাম লাগে—ওটাকে কিনে ফেল। চাকলার মধ্যে বাড়ির দোরে ঐটুকু—ও আমি বাদ রেখে যাব না। বাদ রেখে গেলে ও আর হবে না। যেমন করে হোক—বুঝলে? ধর্ম-অধর্ম বাছতে গেলে চলবে না।

কর্মচারীটি নীরবে আদেশ শুনিল, কোন উত্তর দিল না। মহেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন—হাসপাতাল, ইস্কুল, কুয়ো, টিউবওয়েল যা যা সব করা হয়েছে সেগুলোর আলাদা একটা দলিল হবে। দেবোত্তরের কতগুলো সম্পত্তি নিয়ে ঐগুলোর মধ্যে দিতে হবে। তার থেকে এ সবের খরচ নির্বাহ হবে।

কর্মচারী শুনিয়া গেল। কিন্তু যেমন নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পর মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—দাঁড়িয়ে রইলে যে। কিছু বলবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মুশকিল হচ্ছে—

—কি?

—আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কানাই একলা পেরেও উঠছে না।

—হুঁ।

মহেন্দ্রবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সূর্য পাটে বসিয়াছে। অস্তরাগ-রঞ্জিত আকাশে বিচিত্র বর্ণশোভা।

কর্মচারীটি বলিল—পিসীমা বলছেন এসে থাকতে চান। বলছেন—আমার বয়স হল, মরতে চলেছি, আমার আবার রোগের ভয়! তা তিনি—

—না। পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে একের পর এক আর একজনকে ধরবে। সে হবে না।

—তা হলে কি কলকাতা থেকে একজন নার্সের ব্যবস্থা—

—না। সেও সুবিধে হবে না।

অকস্মাৎ যেন চিন্তার ঘোর হইতে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—এক কাজ কর। কড়ি গাঙ্গুলীর কাছে লোক পাঠিয়ে দাও।...না। একেবারে লোক পাঠিয়ে দাও, রমা বলে যে ঝি-টি এখানে ছিল তার কাছে। সে হয়তো আসতে পারে।

সঞ্জীবের শরীর ও মনের অবস্থা দেখিয়া যাই-যাই করিয়াও নলিনী যাইতে পারিল না। এক মাস অতিক্রান্ত হইয়া গেল। নলিনী চঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার তাহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা আসিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ আছে। তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহার কর্তব্য যথাসাধ্য সে করিয়াছে।

কিন্তু এদিকে সঞ্জীবের অবস্থা দেখিয়া চিন্তা উদ্বেগ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ভগ্ন শরীরের এতটুকু উন্নতি হয় নাই। বরং যেন অবনতিই ঘটিয়াছে। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়ে সে। একটা বিমর্ষতার মধ্যে সদা-সর্বদাই যেন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাহাকে প্রফুল্ল সজীব করিবার জন্য নলিনীর চিন্তার আর অবধি রহিল না। কিন্তু তাও যেন সে চায় না। তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা যেন সঞ্জীবের অহরহ। নলিনীর চিকিৎসকের মন, নানা কঠিন ব্যাধির উপক্রমণিকা এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিল। কর্মে প্রবৃত্তি নাই, প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে কোন বস্তুই যেন তাহাকে আকর্ষণ করে না।

প্রত্যহই নলিনী তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য বলিত। সেদিন সে তাহাকে জোর করিয়া ধরিল।

—চলুন সঞ্জীববাবু, একটু বেড়িয়ে আসি। আজ আপনাকে যেতেই হবে। সেই টিলার উপরে যাব, চলুন।

সঞ্জীব তাহার মুখের দিকে চাহিল। তারপর বলিল—না।

—কমরেডের আহ্বান—এ আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

সঞ্জীব নীরব হইয়া রহিল। নলিনী বলিল—আমার অনুরোধ রাখবেন না সঞ্জীববাবু? দু-একদিনের ভেতরেই চলে যাব আমি। আপনাদের সেই টিলার ছবি বড় ভাল লাগে আমার।

সঞ্জীব আর না বলিতে পারিল না।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়া রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবুও প্রখরতার শেষ নাই। পায়ের তলায় মাটির বুকে বসন্তে উদ্গত ঘাসগুলির মাথায় ছোট ছোট ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। আশেপাশে বহু আকন্দফুলের গাছ। সেখানেও সব ফুলের স্তবক শুকাইয়া গিয়াছে। তপোভঙ্গে রুদ্রের রোষবহ্নিতে বসন্তশোভার অন্তরালে মদন যেন ভস্ম হইয়া গেল। দিগন্তে এখানে ওখানে কালো মেঘ মাঝে মাঝে যেন ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সঞ্জীবের কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে চলিয়াছিল নতমুখে নীরবে।

একস্থানে নলিনী বলিয়া উঠিল—এইখানেই আমাকে সেদিন ফুল পেড়ে দিয়েছিলেন, না?

সঞ্জীব বলিল—হুঁ।

নলিনী বলিল—আপনার কি হয়েছে সঞ্জীববাবু? অনেক দিন থেকেই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। সঙ্কোচের জন্য তা পারি নি। আজ কিন্তু আর থাকতে পারলাম না।

সঞ্জীব শুষ্কস্বরে বলিল—কিছু তো হয় নি।

—আমার কাছে লুকোবেন না। শরীরে কি অসুস্থতা অনুভব করেন?

—না।

—তবে?

সঞ্জীব কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল—মনের অসুস্থতা আমার। কিন্তু সে বলতে আমায় অনুরোধ করবেন না মিস গাঙ্গুলী।

ব্যথিত চিত্তে নলিনী বলিল—আমায় এত পর ভাবেন আপনি!

সঞ্জীব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল—সাবধানে এবার মিস গাঙ্গুলী। টিলা আরম্ভ হল।

নলিনী হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—দুর্গম পথের যাত্রী আমরা। হাতে হাত দিন কমরেড। টিলার পর টিলা অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়াছিল।

নিস্তব্ধ গুমোট অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ একখানি ছায়া যেন মমতার মত

তাহাদের সঙ্গে আসিয়া পড়িল।

নলিনী বলিল—আঃ, ছায়াটি বড় মধুর লাগল, না সঞ্জীববাবু? দেখুন দেখুন সঞ্জীববাবু, কি ঘন কালো মেঘ!

সঞ্জীব মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল।—এ কি! এ যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে! উপরের দিকে তো তাকাই নি! ফিরুন, ফিরুন।

নলিনী তখনও আকাশের দিকেই চাহিয়া ছিল। পুঞ্জিত নিকষ-কালো মেঘ তুলার মত ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া দ্রুতবিস্তারে পরিধিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। চারিদিক বিষণ্ণ নিথর। দলে দলে পাখীরা ত্রস্তস্বরে কলরব করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে লোকালয়ের দিকে। ঊর্ধ্বে আকাশের কোলে ঘূর্ণায়মান বিন্দুর মত চিল-শকুনেরা পাক খাইয়া খাইয়া ত্বরিত বেগে নীচে নামিয়া পড়িতেছিল। দূর-দিগন্তে একটা গর্জমান শব্দ ক্রমশঃ যেন নিকট হইয়া আসিতেছে।

দ্রুতপদে দুজনে ফিরিয়া চলিয়াছিল। গর্জমান শব্দটা ক্রমশঃ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ চারিদিকের মেঘাচ্ছন্নতার ছায়ার ম্লানিমা চকিত হইয়া উঠিল একটি তীব্র নীল দীপ্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গর্জনধ্বনি।

সঞ্জীব দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া দেখিয়া সে বলিল—ঝড় যে এসে পড়ল! আশ্রয়—আশ্রয় কোথায় পাই?

নলিনী পিছন ফিরিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্ত একটি প্রগাঢ় ধূলার যবনিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

সঞ্জীব উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছিল।

নলিনীই তাহাকে ডাকিল—সঞ্জীববাবু, আসুন অসুন ঐ গর্তটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। রাস্তার জন্য বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাহারা টিলার পার্শ্বদেশ কাটিয়া কাঁকড় লইয়া গিয়াছে। তাহারই ফলে ছোট একটি গহ্বরের মত আশ্রয়। তাহারই মধ্যে উভয়ে গিয়া আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে গর্জমান ঝড় টিলার মাথার উপর দিয়া বিপুল বেগে বহিয়া গেল।

ঝঞ্ঝাতাড়িত উপলখণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষে বিচিত্র শব্দ উঠিতেছিল। ঝড়ের প্রবাহের মধ্যে একটা উন্মত্ত হা-হা রব। ধূলার প্রবাহে চারিদিক অন্ধকার। ছোট গহ্বরটির মধ্যে দুটি নর-নারী শঙ্কাতুর বিস্ময়ে ঝড়ের এই উন্মত্ত লীলা দেখিতেছিল।

অকস্মাৎ নলিনী বলিয়া উঠিল—অদ্ভুত, এ অদ্ভুত সঞ্জীববাবু!

—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে আদিম যুগের মানুষ আমরা। ঝড়ের তাড়নায় আজই সর্বপ্রথম নীড় আবিষ্কার করলাম এই গহ্বরের মধ্যে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সঞ্জীবের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল।

বিপুল উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ নলিনী, হ্যাঁ। আদিম যুগের মানুষ আমরা—আমি নয়—তুমি নারী। ঝঞ্ঝার তাড়নায় গহ্বরের মধ্যে অকস্মাৎ একত্র হয়েছি

নীড় রচনার জন্য। ভবিতব্যতার বিধানে—প্রকৃতির ইঙ্গিতে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে নলিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হাত দুটি ধরিয়া সঞ্জীব কম্পিত স্বরেই বলিল—নলিনী, আমি তোমায় ভালবাসি।

তাহার স্পর্শে নলিনী চমকিয়া উঠিল। ব্যস্তভাবে বলিল—উত্তেজিত হবেন না সঞ্জীববাবু, আমরা কমরেড।

উত্তেজনাভরেই সঞ্জীব বলিল—হ্যাঁ—কমরেড, কর্মসাথী। নীড় রচনা করব আমরা দুজনে। আমি বয়ে নিয়ে আসব উপাদান, তুমি করবে রচনা। আমরা সত্যিই কমরেড।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীবাবু!

—শুনতে পাচ্ছি তোমার ডাক। কিন্তু জান নলিনী, প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযত করা চলে, কিন্তু প্রকৃতির প্রেরণাকে অবহেলা করবার সাধ্য কারও নাই। একদিন তোমাকে বলেছিলাম, রুদ্রের অনুচর আমরা, আমাদের তপোবনে মদনের প্রবেশ নিষেধ। ভুল—ভুল, স্বীকার করছি সে ভুল। তোমার কথাই সত্য, মদন ভস্ম হয়, কিন্তু প্রকৃতির দুলাল অতনুর গতি অবারিত।

নলিনী বলিল—সঞ্জীববাবু, তা হয় না। আর তা হয় না। মায়ের কাছে যে পথ আমি পেয়েছি—সে পথ ত্যাগ করব না, করতে পারব না। পথ ছাড়ুন আপনি।

সঞ্জীবের চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—না।

দৃপ্ত ভাবে নলিনী বলিল—আপনি অতি বর্বর, অতি নীচ—অতি হীন হয়ে গেছেন।

সঞ্জীব বলিল—হয়েছি। জান, জেলে বসে বসে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কল্পনায় তোমায় নিয়ে আমি নীড় রচনা করে এসেছি। এ কদিন সেই কথা নিবেদন করবার জন্য পাগলের মত অস্থির হয়ে ফিরেছি। বর্বর, হীন, নীচ যা বল তুমি, হয়েছি তোমার জন্য, তোমায় আমার পেতে হবে।

নলিনী দৃঢ়স্বরে বলিল—পথ ছাড়ুন!

—না।

নলিনী দৃপ্তভাবে এবার সঞ্জীবকে ঠেলিয়া পথ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। সঞ্জীব যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। সে প্রতিরোধকল্পে নলিনীকে ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। সে-ধাক্কা নলিনী সহ্য করিতে পারিল না। ঘুরিয়া উপুড় হইয়া সে শুইয়া পড়িল। সঞ্জীব দাঁড়াইয়া ছিল পাথরের মূর্তির মত।

নলিনী ধীরে ধীরে উঠিল। কপালে একটা ক্ষত হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। রক্তের উত্তপ্ত স্পর্শে নলিনী কপালে হাত বুলাইয়া দেখিল—রক্ত। সে বলিল—দেখুন তো পাগলের মত কি করলেন? ছিঃ!

রক্ত দেখিয়া সঞ্জীবের যেন জ্ঞান ফিরিল। সে নত মস্তকে বলিল—সত্যিই আমি বর্বর, নীচ, হীন, মিস গাঙ্গুলী। আমায় মাফ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ত ঝড়ের মত বাহির

হইয়া গেল। দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আকাশচারী বিহঙ্গের মত দূর-দূরান্তে সে যেন ভাসিয়া চলিয়াছিল। পিছন হইতে বাতাসের সঙ্গে ভাসিয়া আসিল—সঞ্জীববাবু—সঞ্জীববাবু! সে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। দেখিল তাহার পশ্চাতে নলিনী তাহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছে।

—এই ঝড়ের মধ্যে নির্জন প্রান্তরে আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যাবে তুমি! ফিরে এস—নয়তো দাঁড়াও। আমায় সঙ্গে নাও।

বহু কষ্টে সঞ্জীব ফিরিল। নলিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে বলিল—এত বড় শাস্তি দিতে চাও কেন তুমি আমাকে? কী করেছি তোমার আমি? কোথায় যাবে তুমি? জান, মা তোমার ভার আমায় দিয়ে গেছেন!

সঞ্জীব স্থির দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপন করিল এবং বলিল—সত্যি কথা নলিনী?

নলিনী তাহার হাত ধরিয়া বলিল—ঝড় এখনও থামে নাই। এস ওখানে যাই। যে নীড় রচনা করেছি, আজ এত শীঘ্র তাকে ভেঙে দিয়ো না।

গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিনী বলিল—হ্যাঁ, মা তোমায় আমার উপর ভার দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তুমি আমায় কমরেড হিসাবে চেয়েছিলে, তারই উপযুক্ত করে আমাকে গড়ে তুলেছি আমি।

কয়েক ফোঁটা রক্ত তাহার নাক বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সেটুকু অনুভব করিয়া বলিল—কিন্তু এ কি করলে বল তো!

রক্তের ধারা সে মুছিতে গেল। বাধা দিয়া সঞ্জীব বলিল—মুছো না। এস, ওই রক্ত নিয়ে আমি তোমার সীমন্তের সিঁদুর রচনা করে দিই। গুহার মধ্যে মিলন আমাদের—এই আমাদের বিবাহ। আমি নর—তুমি নারী। আমি বর—তুমি বধূ। একসঙ্গে দুজনে নীড় রচনা করব। এক কর্মে আমাদের চারখানি হাত অগ্রসর হয়ে আসবে। আমরা কমরেড—এস।

* * * *

আরও কয়টা টিলার পরে—একটা টিলার উপর সেই বাংলোটার মধ্যে তখন মহেন্দ্রবাবু শয্যায় শুইয়া ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। রমা আসিয়া শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিতেছিল।

রমা আসিয়াছে—আজই আসিয়াছে। আহ্বান মাত্রেই সে আসিয়াছে। মহেন্দ্রবাবু মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়াছিলেন তখন।

কর্মরতা রমার দিকে চাহিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—রমা!

রমা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তিনি বলিলেন—তুমি থাকবে তো রমা?

মৃদু অনুচ্চ স্বরে শান্ত মেয়েটি বলিল—থাকব।

তাহার হাত ধরিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন—উইলে তোমায় আমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাবো রমা।

তিনি তাহাকে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমা বলিল—না।

বাবু বলিলেন—ঈশ্বরের দিব্যি রমা—

রমা শুধু হাসিল। বিচিত্র তিক্ত হাসি।

তারপর বলিল—ওষুধ খাবার সময় হয়েছে আপনার।